TrainTrackers এর একটি প্রয়াস

রেল ক্যানভাস

পুজো সংখ্যা - ১৪২৭

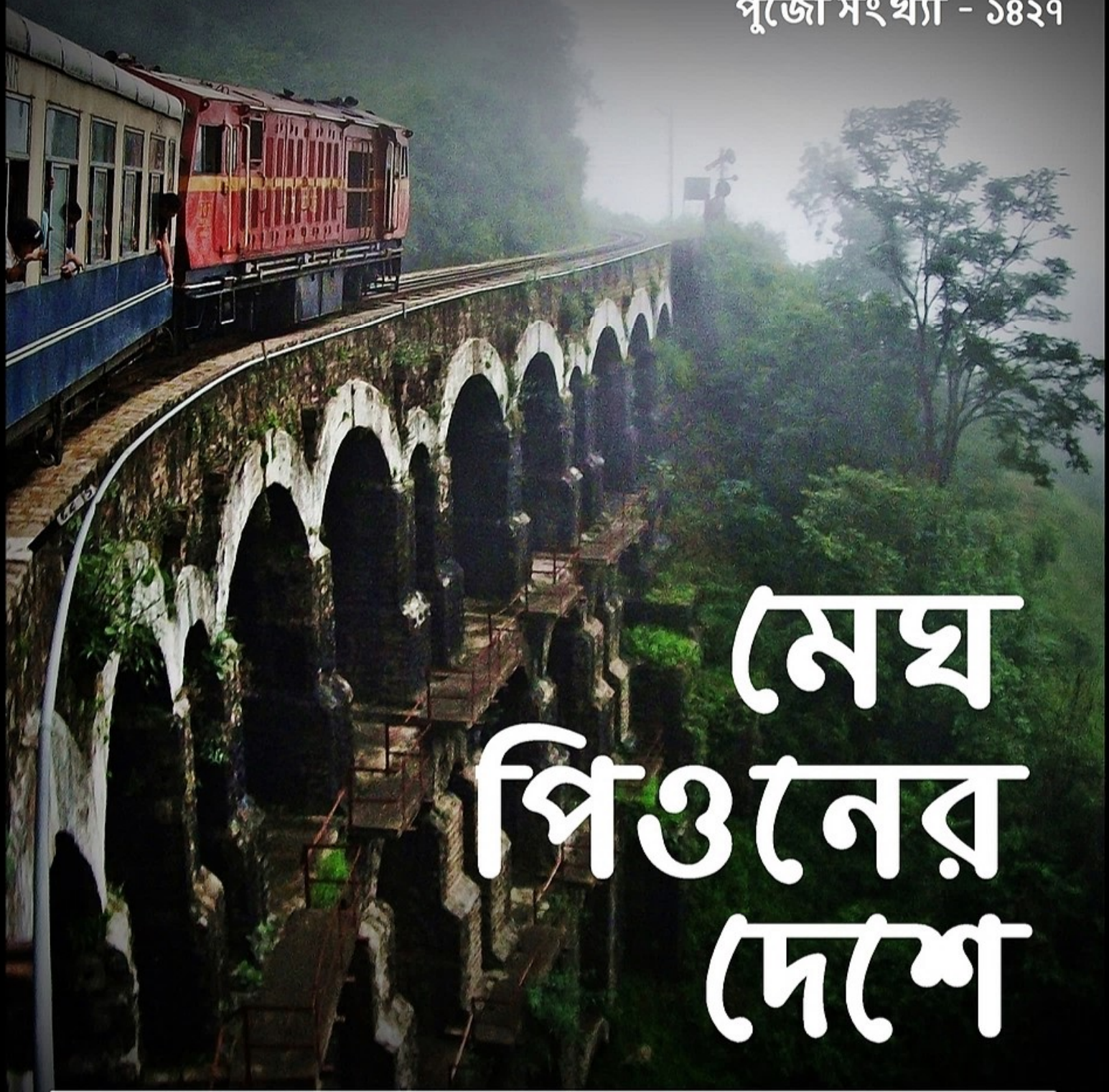

মেঘ পিওনের দেশে

রেলের চাকায় বিহুর দেশে ~ রূপকথার রেলে সহ্যাদ্রির কোলে ~ রেলপ্রেমীর ডাইরি

কলকাতা রাজধানীর ৫০ বছর ~ বাঁকুড়া-মসাগ্রাম রেলপথ ~ বেয়ার গ্যারাট

সম্পাদকের কলম থেকে...

ভারতীয় রেলে রেলফ্যানিং বা রেলের প্রতি প্রেম এই জিনিসটা বেশ জনপ্রিয় একটি ব্যাপার। রেল নিয়ে পড়াশুনা, চর্চা, রেলের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে জ্ঞান আহরণ করাই রেলপ্রেমের মূল বৈশিষ্ট্য ।

প্রতিটি মানুষের জীবন-চক্রের সাথে সর্বদাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে রেলের চাকা। সেই শৈশবে পরিবারের সাথে রেলগাড়ি চড়ে ভ্রমণ থেকে শুরু করে বর্তমানের একঘেয়ে কর্মব্যস্ত জীবনের প্রয়োজনীয় যাত্রা, রেল কিন্তু সব জায়গাতেই জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে। শুধুমাত্র ট্রেন যাত্রা থেকে নয়, স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখা ও লেন্সবন্দি করা, ট্রেন ও স্টেশনের মানুষের জীবনযাত্রাকে চাক্ষুস করা ও তা উপলব্ধি করা, বিভিন্ন ট্রেন সম্পর্কে নানাবিধ খোঁজ খবর রাখা, ট্রেন অপারেশনের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা, ইঞ্জিনের প্রকারভেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান, ট্রেনের সময় সারণী থেকে শুরু করে ট্রেনের গতি এই সবকিছু একত্রিত হয়ে মস্তিস্কে স্থান পায়। এইরকমই এক একটি মস্তিস্কের অধিকারী এক একজন রেলপ্রেমী। তাই একজন রেলপ্রেমীকে রেল গবেষক বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। পাশ্চাত্য দেশেগুলিতে রেলপ্রেম তথা Ferroequinology বিশেষ গবেষণার বিষয় কিন্তু ভারতবর্ষে তা কেবলই শখের উপাদান মাত্র। এই নিঃশর্ত ভালবাসার প্রতি প্রদত্ত সময় ও শ্রম আজও আপামর জনগণের দৃষ্টিতে নিছকই পাগলামি বা বিলাসিতা।

তবে সে যাই হোক, অধিক পরিচিতি না পেলেও রেলপ্রেমীর সংখ্যা দেশে কম নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রেলপ্রেমীদের মধ্যে সংযোগস্থাপন অনেক সহজতর হয়েছে.... বেড়েছে পরিচিতি.... আজ আমরা এক বৃহৎ পরিবার। এ কথা অনস্বীকার্য যে সামাজিক মাধ্যমের কারণেই সমগ্র রেলপ্রেমী সম্প্রদায় আজ ছবি ও তথ্য উপাদানে সমৃদ্ধ।

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,

বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।"-

সত্যিই, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন তার সংস্কৃতি। কিন্তু এই ভিন্নতার পরেও আমাদের একটাই পরিচিতি যে আমরা ভারতবাসী। "ভারতবর্ষে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য"- ভিন্ন প্রদেশের এই ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র কিন্তু কোনভাবেই এই রেলপ্রেমী বন্ধুদের আলাদা করতে পারেনি। অচেনা অজানা দুইটি ভিন্ন প্রদেশের মানুষ খুব সহজেই একে অপরের কাছে চলে আসে ও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক নিবিড় বন্ধন যার নেপথ্যে রয়েছে 'রেল'। হ্যাঁ 'রেল'! এই ছোট্ট শব্দটির এক অপার ক্ষমতা যা উত্তরে বারামুলা থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী ও পূর্বে লিডো থেকে পশ্চিমে ভুজকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। ভিন্ন প্রদেশের রেলপ্রেমীরা একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে একটি রেল পরিবার।

ভারতীয় রেলের নিরন্তর চলা গতিরপথে বাধা হেনেছে নভেল করোনা ভাইরাস। গত ২২ শে মার্চ ২০২০ থেকে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে যাত্রীবাহী রেলগাড়ির চাকা। যদিও পণ্যবাহী ট্রেন নিরন্তর পরিষেবা দিয়ে চলেছে ভারতীয় জনগণকে। পরবর্তীতে শ্রমিক স্পেশাল ও কিছু প্রিমিয়াম স্পেশাল ট্রেন দিয়ে যাত্রী পরিষেবা আংশিকভাবে শুরু করা সম্ভব হয়েছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই মহামারী পাল্টে দিয়েছে আমাদের জীবনধারা, শহরতলীর মানুষ ভুলতে বসেছে তাদের জীবনরেখা ভালোবাসার লোকাল ট্রেনকে। দীর্ঘকালীন চলা এই লকডাউন পিরিয়ডে মানুষ বেঁচে রয়েছে পুরাতন দিনের সুখ স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে, যেমন আছে রেলপ্রেমীরাও। পুরোনো দিনের রেলযাত্রা, রেলকে নিয়ে ভালোবাসার মুহূর্ত, রেলের যন্ত্র দানব দের নিয়ে গবেষণা সব কিছুকে একত্রিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে একটি মিলনকেন্দ্র, যার নাম - "রেল ক্যানভাস"।

"রেল ক্যানভাস" নামটি হয়তো সবার কাছে আজ আর অজানা নয়, কারণ আমরা পথ চলা শুরু করেছি এইবছর স্বাধীনতা দিবসের শুভলগ্নে। রেলপ্রেমীদের কলমের ছোঁয়ায় রেল এবং রেলপ্রেম সম্পর্কিত নানাবিধ লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের ইংরাজী মাধ্যমে সম্পাদিত প্রথম সংখ্যা। আমরা খুঁজে পেয়েছি একজন রেলপ্রেমীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাহিত্যকারকে, প্রতিটি রেলপ্রেমী অর্থাৎ যারা কিনা রক্ত মাংসের তৈরি মানুষের বদলে লৌহ শকটকে ভালোবাসে, তারাও যে প্রকৃত প্রেমিকের সত্ত্বা বহন করে চলে তার প্রমান আমরা পেয়েছি বহুবার। এখানে আমরা পেয়েছি বহু গুণী মানুষের সান্নিধ্য, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা।

এই সবকিছুকে পাথেয় করে আমাদের নবতম নিবেদন "রেল ক্যানভাস"- শারদ সংখ্যা। বাংলার সুবিশাল রেলপ্রেমী ও পাঠককুলের কথা মাথায় রেখে আমাদের এই শারদ সংখ্যা সম্পূর্ণভাবে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হল

শুভ শারদীয়া
১৪২৭

রেল ক্যানভাস

এটি একটি বৈদ্যুতিন ভাবে উৎপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যের e-পত্রিকা সংস্করণ এবং এর কোনো প্রকার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। এই e-পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে TrainTrackers -এর নিজস্ব সৃষ্টি। এই সংস্করণ অথবা e-পত্রিকা সম্বন্ধিত কোনো প্রকার জিজ্ঞাস্য থাকলে যোগাযোগ করুন – railcanvaz@gmail.com

TRAINTRACKERS
প্রকাশক

কৌস্তভ চৌধুরী
মুখ্য সম্পাদক

অর্কোপল সরকার
যুগ্ম সম্পাদক

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী
গ্রন্থন, পরিকল্পনা ও সঙ্কলন

অনমিত্র বোস
সহকারী সম্পাদক

শ্রেয়া চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক

সোমশুভ্র দাস
সহকারী সম্পাদক

শুভদ্যুতি বোস
সহকারী সম্পাদক

TEAM TRAINTRACKERS

সোমশুভ্র দাস
অধ্যক্ষ

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

অঞ্জন রায় চৌধুরী
যুগ্ম সম্পাদক

শুভদ্যুতি বোস
কোষাধ্যক্ষ

অর্কোপল সরকার, অনমিত্র বোস, কৌস্তভ চৌধুরী
সদস্যবৃন্দ

অর্ণব বাগচী
প্রযুক্তিগত সহায়তা

সুমন্ত চৌধুরী
মুখ্য উপদেষ্টা

© TrainTrackers. সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই e-পত্রিকার সমস্ত বিষয়বস্তু অর্থাৎ রচনা, ছবি, প্রবন্ধ, কাহিনী, নকশা, শিল্পকলা -র সমস্তকিছু স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত। কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অনুমতি ব্যতীত, এইসবের কোনো প্রকার প্রতিলিপি, অনুলিপি বা পুনরুৎপাদন কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই e-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত (গুলি) সম্পূর্ণ ভাবে লেখকদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। তা কোনোভাবেই TrainTrackers -এর এবং ভারতীয় রেলের সরকারি নীতি বা মতামত বা দর্শন হিসেবে গণ্য করা যাবে না। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই, প্রদানকারী লেখক, চিত্রগ্রাহক বা তথ্যপ্রদানকারি ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে এই e-পত্রিকার বিষয়বস্তু একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে TrainTrackers সেই প্রদানকারীদের মতামতের সাথে কোনো প্রকারে সহমত পোষণ করে বা ভবিষ্যতে করবে। এবং এই প্রসঙ্গে এও জানানো হচ্ছে যে এই e-পত্রিকায় প্রদানকারী বিষয়বস্তুগুলির যথাযোগ্যতা, সম্পূর্ণতা ও মূল্যায়নের দায়ভার TrainTrackers -এর ওপর কোনোভাবেই বর্তায় না। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রদানকারীদের বিবেচ্য।

দুর্গোৎসব, যদিও করোনা আবহে এবছর সে উৎসবের আনন্দ কিছুটা হলেও ম্লান। তবে সেই মলিনতাকে সরিয়ে, পুজোর আনন্দকে আরো একটু বাড়িয়ে তুলতে, মহাষষ্ঠীর শুভলগ্নে পথ চলা শুরু হল "রেল ক্যানভাসের" প্রথম শারদীয়া সংখ্যার।

করোনার এই দুঃসময়ে ভ্রমনপ্রেমী বাঙালি যখন গৃহবন্দী, তখন তাদেরকে ভার্চুয়ালী, হিমালয়ের কোলে ছোট রেলে চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনতে শ্রী রুদ্রনীল রায় চৌধুরী নিয়ে এসেছেন - "মেঘ পিওনের দেশে"। এই রেল যাত্রায় আমরা কেবল কালকা থেকে সিমলা অবধি বিস্তৃত ছোট রেলপথটি ধরেই যে ঘুরবো তা কিন্তু নয়, আমরা জানবো তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আলোকপাত করার চেষ্টা করবো অনেক অজানা তথ্যে, চেষ্টা করবো ছোট রেলের মাধ্যমে হিমাচলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আস্বাদ নেওয়ার।

অপরূপ হিমাচলে মানস ভ্রমণের রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই চলুন না একটু পশ্চিম ভারতের পাহাড়ের কোলে ঘুরে আসি। রূপে ও সৌন্দর্য্যে তারা কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। ভারতের পাহাড়ি রেলপথ গুলোর অন্যতম একটি শাখা রয়েছে এইখানেই, নেরল - মাথেরান লাইট রেলওয়ে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলা এই রেলপথকে চিত্রায়নের মাধ্যমে পাঠককূলের কাছে তুলে ধরেছেন শ্রী সোমশুভ্র দাস, তাঁর লেখা - "রূপকথার রেলে সহ্যাদ্রির কোলে" -এর দ্বারা।

হিমাচল ও পশ্চিমঘাট ঘোরার পরে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য বিহুর দেশে। "বিহুর দেশ", বলতেই চোখের সামনে যেটা ভেসে আসে, সেটা হল দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মেলা আর তার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পাহাড় আর তার গা বেয়ে নেমে আসা জলরাশির ধারা এবং সাথে অবশ্যই ব্রহ্মপুত্র। জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের জানলার ধারে বসে এক কাপ কফি হাতে গুয়াহাটি থেকে যোরহাট টাউন পর্যন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে দেখার সাথে আসাম রাজ্যের জীবনযাপনকে স্পর্শ করতে বেরিয়ে আসা যাক প্রকৃতির রানীর দেশে। সাথে রয়েছেন গাইড শ্রী কৌস্তভ চৌধুরী।

বিহুর দেশে ঘোরার আনন্দকে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে সৌরভ দাস নিয়ে এসেছেন অপূর্ব সব ছবি সমৃদ্ধ বগিবিলে কাটানো একটি গোটা দিনের গল্প।

পাহাড় থেকে এবারে একটু সমতলে নেমে আসার পালা, কারণ পরের গন্তব্য লাল মাটির দেশে। যেখানে শ্রী অর্কোপল সরকারের কলমে উঠে এসেছে নতুন করে গড়ে ওঠা এক শতাব্দী প্রাচীন রেলপথের কথা। দামোদর উপত্যকাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ের (B.D.R.) যে ছোট রেলপথটি পূর্ব বর্ধমানের রায়নগর অবধি বিস্তৃত ছিল তা কয়েক বছর আগে বড়ো হয়ে ফিরে এসেছে এবং সম্প্রসারিত হয়েছে মসাগ্রাম পর্যন্ত। সবুজের গালিচা দিয়ে ঘেরা ক্ষেত, নদী ও লাল মাটির মিলন তীর্থ এই রেল শাখায় ভ্রমণ করতে ও সেই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রার সাথে পরিচয় করতে হলে, মসাগ্রাম স্টেশন থেকে বাঁকুড়া গামী দুপুর ১২:২০ মিনিটের ডেমু ট্রেনে চড়ে বসুন।

বাঁকুড়া রায়নগর দামোদর উপত্যকা লাইনে যতদিন ছোট রেল চলেছিল, ততদিন কিন্তু রাজত্ব করেছিল স্টিম ইঞ্জিন। কালো ধোঁয়া উড়িয়ে ঝিক্ ঝিক্ শব্দে চলা সেই দৃশ্য আজও স্মৃতির ক্যানভাসে সঞ্চিত রয়েছে। শুধুমাত্র এই ছোট লাইন নয়, স্টিম ইঞ্জিনের দাপট কিন্তু একটা সময় গোটা দক্ষিন পূর্ব রেলের বড়ো লাইন জুড়েও ছিল। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তৈরি বেয়ার গ্যারাট ইঞ্জিন একসময় দাপিয়ে রাজত্ব করে গেছে এই দক্ষিন পূর্ব রেলে। সেই সব স্বর্ণালী দিন আজকে ইতিহাসের পাতায়। কেমন হয় যদি ইতিহাস কে পুনরায় জাগ্রত করে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা যায়? হ্যাঁ, ঠিক এইটাই বাস্তবায়িত হয়েছিল ২০১৮ সালে। শতবর্ষ ছুইছুই গ্যারাট ইঞ্জিনকে দিনরাত এক করে আবার জাগিয়ে তুলে চালানো হয়েছিল খড়গপুর থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত। রেললাইনের দুই ধারের আবালবৃদ্ধবনিতা যেন ফিরে পেয়েছিল ইতিহাসের সেই নায়ককে। সেই ঐতিহাসিক দিনে আরও একবার ফিরে যেতে নজর রাখুন শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায়ের লেখা "বর্তমানে অতীতের ছোঁয়া"।

ভারতীয় রেলে ডিজেল ইঞ্জিনের ভূমিকা অপরিসীম এবং তাতে বৈচিত্রের কিন্তু কোন অভাব নেই। রেল ক্যানভাসের শারদ সংখ্যায় তাই রেল নিয়ে টেকনিক্যাল আলোচনা বিভাগে রয়েছে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের একটি শাখা "ই এম ডি লোকোমটিভ"। এই ব্যাপারে জানাতে সঙ্গে থাকছেন শ্রী বরুনদেব শর্মা।

স্বাদ বদল করতে এরপর আসছে একটি অন্য রকমের গল্প। আমাদের দেশে রেলফ্যান ও রেলম্যান এর মধ্যে একটি অসাধারন সুসম্পর্ক রয়েছে, রেল ফ্যানদের রেল নিয়ে নানাবিধ জ্বালাতন তারা মুখ বুজে ও আনন্দের সাথেই মেনে নেন। কারণ বেশিরভাগ রেলম্যানরাও ধীরে ধীরে রেলকে ভালোবেসে রেলফ্যানই হয়ে যান। এইরকমই একজন রেলম্যান তথা রেলফ্যান শ্রী বিপ্লব দেবনাথের "ডায়েরির পাতা থেকে" শুনবো রেলপ্রেমের প্রতি আবেগ ও অনুভূতির কথা।

এছাড়াও রেলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেও রেলফ্যানদের যোগদানের উদাহরণ কিন্তু অনেক । যেমন দেশের প্রথম কুলিন ট্রেন অর্থাৎ হাওড়া-নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তীতে ট্রেন ও ইঞ্জিনটি সাজানোতে রেলম্যানদের সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেছিল রেলফ্যানেরাও। ভালোবাসার ট্রেনকে তার জন্মদিনে নিজ হাতে সাজানোর অনুভূতি এক আলাদা রকমেরই। সেইদিনের সেই গল্প শোনাতে কলম ধরেছেন শ্রী ঐশিক ভট্টাচার্য, তার নিবেদন, "সুবর্ণজয়ন্তীতে ভালবাসার রাজধানী"।

এছাড়াও আছে কলকাতা মেট্রো রেলের সাম্প্রতিকতম মাইলস্টোন নিয়ে একটি প্রতিবেদন "২৫ বছর পরে তিলোত্তমার মেট্রোর পুনরায় পাতাল প্রবেশ"। সাথে রয়েছে "জলছবি" যেখানে থাকছে বাংলার রেলপ্রেমীদের দেওয়া রেল নিয়ে চালচিত্র যা নিঃসন্দেহে মন কাড়বেই।

মহামারীর এই দুঃসময়ে মানুষের মন থেকে যখন আনন্দ আর হাসি দুটোই হারিয়ে গেছে, তখন আবার একবার ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ জুগিয়ে তুলতে, "নিউ নর্মাল" অধ্যায়ে জীবনকে পুনরায় রঙ্গিন করে স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে আনার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হল "রেল ক্যানভাস"।

পরিশেষে থেকে ধন্যবাদ জানাই তাদের, যাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এই প্রচেষ্টা কোনোদিনই সম্ভব ছিল না। ধন্যবাদ জানাই সকল সদস্যদের যাদের লেখা ও ছবি স্থান করে নিয়েছে রেল ক্যানভাসের দুই মলাটের মাঝে। ধন্যবাদ জানাই সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের। সকলের আশা ও সহযোগিতার হাত এইভাবেই আমাদের মাথার ওপর থাকুক, যাকে সম্বল করে আমরা যেন বারবার ছুঁতে পারি প্রত্যাশার উচ্চতম সীমা।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলকে জানাই শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।।

কৌস্তভ চৌধুরী
অর্কোপল সরকার

রেল ক্যানভাস

পুজো সংখ্যা - ১৪২৭

সূচিপত্র

শুভ শারদীয়া

প্রচ্ছদ কাহিনী

মেঘ পিওনের দেশে

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ভ্রমণ কাহিনী

রূপকথার রেলে সহ্যাদ্রির কোলে

সোমশুভ্র দাস

ভ্রমণ কাহিনী

রেলের চাকায় বিহুর দেশে

কৌস্তভ চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদন

রেলপ্রেমীর ডাইরি থেকে

বিপ্লব দেবনাথ

রেল ক্যানভাস

পুজো সংখ্যা - ১৪২৭

সূচিপত্র

শুভ শারদীয়া

চিত্র কাহিনী

বোগিবিলের স্বপ্নসফরে...

সৌরভ কুমার দাস

ভ্রমণ কাহিনী

নব দিগন্তের পথে...

অর্কোপল সরকার

বিবিধ

৫৪ **মেট্রোর পুনরায় পাতাল প্রবেশ**
অর্কোপল সরকার

৫৭ **জল ছবি**
রেলে সম্বন্ধিত চিত্র সংকলন

জানা-অজানা

বর্তমানে অতীতের ছোঁয়া

সুমন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা রাজধানির ৫০ বছর

ঐশিক ভট্টাচার্য

ইএমডি -র তত্ত্ব-তালাস

বরুণদেব শর্মা

এল খুশির শরৎ, একটু হিমেল হাওয়া।
পুজোর ভোরে ঢাকের আওয়াজ, মায়ের কাছে যাওয়া।
অনেক খুশি অনেক আলো, পুজো সবার কাটুক ভালো।
শারদীয়ার শুভেচ্ছা।

শিউলি ফুলের গন্ধে ভরে গেল মন,
শুভ্র কাশের দোলাতে জুড়ল দু নয়ন॥
আগমনীর বার্তা বয়ে বাজছে ঢাকের সুর,
শারদীয়ার দিনগুলো হোক আনন্দ মধুর॥
HOWRAH
650
12·CAR
12·CAR

রেলপ্রেমীর ডাইরি থেকে

বিপ্লব দেবনাথ

ডিউটি শেষ করে সাইকেল চালিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ঢুকছিলাম। শ্যেনদৃষ্টির মতো তখন লক্ষ্য একটাই যে, কত তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে আর উদরপূর্তি করে একটু 'স্বাধীন' হবো! কারণ প্রতিদিনের মতো আজকের তোলা ট্রেন ও ইঞ্জিনের বিভিন্ন ছবিগুলো ফেসবুককেন্দ্রিক বিভিন্ন রেলওয়ে গ্রুপে আপলোড করতে হবে, না হলে যে আমার পেটের ভাত পুরোটাই অপাচ্য থেকে যাবে সেটা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি এটা আমার একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই পড়ে। একটু ভুল বললাম, ওই শব্দটি শুধু আমার না, আমাদের মতো 'রেলফ্যানদের' হবে। আর সাধারণ মানুষের চোখে অনুভূতিহীন এই রেল কেন্দ্রিক ভালোবাসার বিরতি, আজও আমাদের কাছে ভাবনার অতীত।

পথিমধ্যে স্থানীয় এক পাড়াতুতো কাকার ডাকে একটু বিরক্ত হয়েই (বিরক্ত এই জন্যেই উৎপাদিত হয়েছিল যে, ট্রেনের ফটো আপলোড করতে দেরি হয়ে যাবে যে) দাঁড়ালাম, মানে অনিচ্ছা সহকারে দাঁড়াতে হলো আর কি। যতই হোক গুরুজন বলে কথা। ভদ্রলোক, সম্পর্কে আমার বাবার বন্ধু হলেও আমার সাথে সেভাবে কোনোদিনই কথা প্রায় হয়নি বললেই চলে। ওই 'কেমন আছো বাবা? হেঃ হেঃ এই তো কাকু, আপনার আশীর্বাদে তোফা আছি' ইত্যাদি শব্দবন্ধেই উনি আর আমি সীমাবদ্ধ ছিলাম। ধাতস্থ হয়ে সাইকেলের ব্রেক কষে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাঁর প্রশ্নবানে আমি প্রায় জর্জরিত। কোথায় পোস্টিং, বর্তমান বেতন কত থেকে শুরু করে, আমি কবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি (আমার মতে হাঁড়িকাঠে গলা) এসব জিজ্ঞাস্য সহ সাম্প্রতিক পে-কমিশন এর বেতনবৃদ্ধি নিয়ে একবারে যেন আহ্লাদিত হয়ে গলে গেলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ভদ্রলোকের একজন বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের পরে পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার শখ কি?" উত্তরে সটান বললাম, "রেলকে ভালোবেসে মনে-প্রাণে-অন্তরাত্মায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়া।" সাধারণ চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে তিনি বললেন, "হেঁ-হেঁ, সে তো বটেই সে তো বটেই, রেলওয়েতে যখন আছো তখন তো সেটাই স্বাভাবিক, এ আর এমন আশ্চর্য কি!" ক্ষীণ রাগত হয়ে বেশ উদাত্তস্বরেই বললাম, "আমি রেলওয়ের ট্র্যাক, ইঞ্জিন, সিগনাল, হর্ন এসবের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই মিশে যেতে চাই এদের সাথে। আমি আর রেলওয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে থাকতে চাই। রেলওয়েই আমার স্বর্গ, আমার প্রেম, আমার অর্ধাঙ্গিনী, আমার সমস্ত সত্তা।" ভদ্রলোকের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝলাম তিনি আমার মধ্যে কিছু সাধারণ মানুষ বিবেচ্য 'অস্বাভাবিকতা' খুঁজে পেয়েছেন, যদিও তা আর অস্বাভাবিক কি। এগুলোর সাথে তো আমরা রেলফ্যানরা পদে পদেই মুখোমুখি হই। তারপর যখন গম্ভীরস্বরে আমার মুখে উচ্চারিত হলো, "ইঞ্জিন আমার প্রেমিকা, তাঁর সাথেই আমি অতিবাহিত করতে চাই আমার সারা জীবন।" তখন আমার আপাদমস্তক আরও একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন এবং মনে মনে হয়তো স্বগতোক্তিই করলেন যে আর কিছুদিনের মধ্যে 'রাঁচিই' আমার একমাত্র উপযুক্ত ঠিকানা হবে। বিস্ময়াবিষ্ট মুখমন্ডলের

অবসান না ঘটিয়েই অবশেষে 'আমি আসি' এই ছোট্ট শব্দটুকু উচ্চারণ করে হনহন করে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম আজ হোক বা কাল আমার অনুপস্থিতিতে কাকার পদধূলি আমার বাসায় পড়বেই পড়বে। বাবা হয়তো শুনবেন, এমনই এক বাক্য যে, "ভালো মেয়ে দেখেশুনে ছেলেটার একটা বিয়ে থা দাও হে, নাহলে তো.....হেঃ..হেঃ"।

রেলওয়ের প্রতি ভালোবাসার নেশা যার মধ্যে একবার ঢুকে গেছে, সেইই একমাত্র অনুভব করতে পারবে এর মাদকতা। তীব্র এই নেশার কাছে অন্য যে কোনো মাদকের নেশা অতীব তুচ্ছ। মনে পড়ে ছোটবেলায় মাঝে মাঝে দুপুরবেলা বাবা-মা যখন ভাতঘুম দিত, আমিও সেই ফাঁকতালে তাঁদের চোখকে ফাঁকি মেরে চলে যেতাম ছেলেবেলার 'দুষ্টুমি' করতে। প্রথাগত দুষ্টুমি নয় কিন্তু সেটা। সমবয়সী সব ছেলেরা যখন মাঠে দাপিয়ে খেলত কিংবা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের নীল আকাশে উড়ন্ত প্রজাপতির ন্যায় ভাবতো, তখন আমি কল্পনায় কিংবা বাস্তবে চলে যেতাম কোনো রেলট্র্যাক এর পাশে। সেখানে কোনো লেভেল ক্রসিং এর রেলিং এ বসে দেখতাম 'রাজা' -র আসা যাওয়া। তীব্র অনুসন্ধিৎসা থাকতো যে, ডিউটিরত গেটম্যান কিভাবে খবর পায় যে ট্রেন আসবে, কিভাবে সিগনাল হবে, ট্রেন এক লাইন থেকে অন্য লাইনে কিভাবে যায়।এরকম আরও আরও অনেক রেলকেন্দ্রিক কৌতূহল মনের কোণে কিলবিল করতো। বয়স তখন কতই বা হবে? ওই ১০ কি ১২।

আমরা রেলপ্রেমীরা সাধারণত ট্রেনেই ভ্রমন করি। কারণ ট্রেনে করে বেড়ানোর অনুভূতি অন্য কোনো পরিবহন মাধ্যম দিতে পারে বলে আমার জানা নেই। সড়কপথে সামান্য দূরত্বের গন্তব্যপথ হলেও অধিকাংশ সময় ট্রেনে করে ঘুরপথেই পাড়ি দিই সেই পথ। আর জানলার পাশের 'হটসিট' হলে তো কোনো কথাই নেই, একেবারে সোনায় সোহাগা। বসে আছি জানলার পাশের 'হটসিটে' ট্রেনও ছুটছে আর সাথে আমিও। কত ইঞ্জিন, কত মালগাড়ি, কত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চোখের নিমেষে আমাদের ক্রস করছে। বিভিন্ন শেডের কত রংবেরঙের ইঞ্জিন, কত রকমের ট্রেন সবই তো চোখভরে দেখি। এতোটাই সেই আকর্ষণ। পার্সোনাল গাড়িতে, কিংবা অনেক কম সময়ের আরামদায়ক এরোপ্লেনে আমরা ভ্রমন করতেই পারি। কিন্তু রেলগাড়ির মজা যে একেবারে অন্য। ছোটবেলায় রবিঠাকুরের রেলগাড়ি চলার সাথে সাথে গাছপালা-

ঘরবাড়ি উল্টোদিকে চলে যাওয়ার অনুভূতিকে তো আমরা প্রতিনিয়তই অনুভব করি। পাহাড়ের কোলে কত সুন্দর নান্দনিক নাম না জানা ছোট্ট স্টেশন, বর্ষার কোঙ্কন রেলওয়ের সৌন্দর্য, বিশাল বড় বড় ব্রিজ আর স্টেশনের চোখ জুড়ানো স্থাপত্য আর কোথায়ই বা পাবো। কোথায় পাবো ছোট লাইনের হুইশেল বাজিয়ে ধোঁয়া ওঠা ট্রেনকে কিংবা আদিবাসী গ্রামের মাঝে অখ্যাত এক নিরিবিলি স্টেশনকে। রেলসম্পর্কে কত যে অনুভূতি কতরকম যে ভাবনা তা বলে বোঝানো সত্যিই দুষ্কর। ভোরবেলায় কোনো স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে ঘুম ভাঙে সেই মাদকীয় কণ্ঠের আওয়াজে, "চায়ে, গরম চায়ে" ধ্বনিত হয় প্লাটফর্ম জুড়ে। এর মাধুর্য আর কোথায় আছে বলতে পারেন? কিংবা হঠাৎ করে অপার বিস্ময়ে লক্ষ্য করা ট্রেনের চাকা কি সুন্দরভাবে একটি ট্র্যাক থেকে অন্য ট্র্যাকে বদল করছে। মনে তীব্র অনুসন্ধিৎসা ট্রেনের ড্রাইভারের কাছে কি গাড়ির মত স্টিয়ারিং থাকে! সেই রেল চালুর সময় থেকে কত যাত্রীর রোজনামচা কত গল্প কত ঘটনাবহুল কাহিনী রচিত হচ্ছে এই রেলযাত্রায়। এ এক অবিরাম চলনপদ্ধতি। ছোট্ট ছেলে বাবার হাত ধরে অপার বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে তীব্র গতিতে ট্র্যাক কাঁপিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসের ছুটে চলা কে। কতই তো দামি দামি ট্রেন আছে শতাব্দী এক্সপ্রেস-গতিমান এক্সপ্রেস এবং আরও কত কি। কিন্তু রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রতি অনুভূতির একটাই নাম- "মহারাজা তোমারে সেলাম"।

অনেকেরই মনে এমন এমন বিশেষ প্রার্থনা কিংবা ইচ্ছে থাকে যেটা সামনে প্রকাশ করলে লোকে তো বিরক্তবোধ করবেই তার সাথে সাথে বক্তার মাথায় কিঞ্চিৎ "ছিটগ্রস্ত" আছে বলে মনে মনে ঠাউরে নেবে। যেসব গন্তব্যস্থলে শত চেষ্টা করেও যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে যখন ট্রেন পাওয়া যায় না অগত্যাই তখন সড়ক যানের ওপর নির্ভর করতে হয়। নিরুপায় হয়ে বিষণ্ন চিত্তে চড়ে বসি বাসে অথবা কোন গাড়িতে, আর মনে মনে প্রার্থনা করি যে যাত্রাপথে যেন একটা রেলগেটের দেখা পাই। রেলগেট গোচরে আসলেই তখন পরবর্তী প্রার্থনা রেলগেট যেন বন্ধ থাকে। আনন্দের মাত্রা শতগুন হয় যখন রোড সিগনাল লাল! আর ওপর দিকে ট্রেনের সিগনালে সবুজ আলো জ্বলজ্বল করে। মানে ধুলো উড়িয়ে ট্রাক কাঁপিয়ে তিনি আসছেন। বাসওয়ালাদের মুখ বিরক্তিতে তখন ঠিক বাংলার পাঁচ। কিন্তু কিছু করার নেই রাজার পথেই রাজা এগোবেন। মুগ্ধতার মাত্রা তখন আরো বেড়ে যায় যখন দেখি কোনো এক বাবা-মা তার সন্তান কে বলেছে "বাবু দেখো দেখো ওই যে ট্রেন যাচ্ছে"। এই আনন্দ যে কি সেটা একমাত্র রেল পাগলরাই বুঝবে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না ঠিক, এই অংশটুকু লেখার সময় চোখ ছলছল করছিল এক বিজাতীয় আনন্দে। ঝাপসা চোখেই দেখি দু পাশে কত রথী-মহারথীর বাহন অপেক্ষায় কখন রাজা আসবেন। অবশেষে নিজের স্টাইলে গম্ভীরভাবে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজামশাই।

আমার ক্ষেত্রে নিম্নক্ত ঘটনাগুলি খুবই সত্যি। আমাদের সবার এমন কিছু বন্ধু থাকে যারা আমাদের মোবাইল ফোন একটু কোথাও রাখলেই ঘাঁটাঘাঁটি করে। কিন্তু আমার বন্ধুরা তো আমার মোবাইল ঘাঁটলে আনন্দ তো দূর বরং বিরক্তিবোধে মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যায় কারণ মোবাইল জুড়েই শুধু রেল এর ছবি, রেল সম্পর্কিত অ্যাপ আর ফেসবুক সহ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে শুধু রেলের ছবি, ভিডিও প্লেয়ার এ রেল এর ভিডিও..... তাই আমার মোবাইল সুন্দর ফিচারের(MI A3) স্মার্টফোন হলেও তাদের কাছে এটা নিতান্তই একটা "কিপ্যাড ফোনে"র সমতুল্য। অলক্ষ্যেই হাসি আমি।

কোনো বন্ধুরা ট্রেনে করে কোথাও ঘুরতে গেছে হয়তো। কদিন পরে ফিরে আসলেই প্রথমে আমার প্রশ্ন, "কোন ইঞ্জিন দিয়েছিলো তোর ট্রেনে"? আমার এটা খেয়ালই নেই, যে তারা সেটা কি করে জানবে। কিছু উত্তর পাই যে, 'লাল ইঞ্জিন না সাদা ইঞ্জিন' বা কিছু উত্তর পাই 'জানি না।' সবচেয়ে বেশি পাই এই উত্তর যেটা হলো, "আমি ঘুরতে গেছি, আমি কি ইঞ্জিন দেখতে গেছি নাকি। তোর এই পাগলামির জ্বালায় সত্যিই অতিষ্ঠ আমরা।" মুচকি হাসি আমার ঠোঁটের কোণে খেলে যায়।

আরো বেশি অবাক হই যখন দেখি রেলপাগলদের অন্য কোনো কাজে সময় না থাকলেও ট্রেন দেখার সময় ঠিক আছে। নতুন কি ট্রেন উদ্বোধন হবে, তার আপডেট সহ ছবি কিংবা ভিডিও নিমেষে হাজির। কোন ট্রেন কি কোচ পাবে, কোন ইঞ্জিন আজ কোন এক্সপ্রেসের সাথে জুড়বে কিংবা কোনো লোকমোটিভের ট্রান্সফার হিস্ট্রি যেভাবে মুখস্ত বলে দিতে পারবে, সেটা পাঠ্যবইও দেখে লজ্জা পাবে। ভাবা যায়, সামান্য হর্ন শুনেই বলে দিতে পারে কোন ইঞ্জিনের হর্নের আওয়াজ সেটা। প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে তীব্র বেগে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে আসছে। মুহূর্তেই স্টেশন ক্রস করে গেল ট্রেনটি। ও বাবা! পাশের এক রেলফ্যানভাই কি সব হিসেব কষে বলে দিল, ট্রেনটি ১২১ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলছে। ভাবা যায়! কনকনে শীতের রাত, জনমানবহীন স্টেশনে কুন্ডলী পাকিয়ে কয়েকটি সারমেয় দিব্যি ঘুমিয়ে রয়েছে। হিম ঠান্ডার রাত চিরে প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে একের পর এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন-মালগাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘুমন্ত ট্রেনের যাত্রীরা, ঘুমন্ত গ্রাম-শহরের মানুষেরা। কিন্তু এ কী! এই কনকনে ঠান্ডায় জেগে রয়েছে শীতপোশাক পরিহিত তিনজন মানুষ। রাতে যে ট্রেনগুলো একের পর এক বেরিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর ছবি আর ভিডিও করছেন তারা। না, তারা রেলকর্মী নন, তারা সবাই ট্রেন স্পটার। কনকনে হিমঠান্ডায় যেখানে সবাই আরামের ঘুমে ঘুমন্ত, আর সেখানে এনারা এসেছেন "নাইট রেলফ্যানিং" করতে। শারীরিক কষ্টতো আছেই সাথে না ঘুমানোর কষ্টও থাকে। কিন্তু সব কষ্ট উধাও হয়ে চোখে মুখে উত্তেজনার সঞ্চার হয় যখনই প্ল্যাটফর্মের মাইকে ঘোষণা হয় "অনুগ্রহ করে শুনবেন এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে খু ট্রেন যাবে, যাত্রীরা নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান"। এই ভালোলাগার অনুভূতি একজন নিখাদ রেলপ্রেমীই বুঝবে।

পরম ভালোবাসার ক্ষেত্র যখন কর্মক্ষেত্র হিসেবে রচিত হয়। ভাবুন তো, এর চাইতে আর পরম পাওনা কিছু আছে। সেই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী আমি। শুধু আমি বলা ভুল, অনেকেই আছেন রেলফ্যান থেকে রেলম্যান হয়েছেন। ভালোবাসার মাত্রাটা সত্যিই যেন দ্বিগুন হয়ে গেছে। আগে অনেক ব্যাপার ছিল যেটা শুধু উপর উপর থেকেই দেখতাম। সেই সব ব্যাপারগুলোই আজ অনেক কাছ থেকে দেখছি জানতে পারছি আরো বিস্তারিতভাবে। রেল সংক্রান্ত কত জ্ঞানচেতনার উন্মেষ ঘটছে। শিখছি আরও শিখছি... কিন্তু ভারতীয় রেলসম্পর্কে সবটুকু কখনোই শিখতে পারবো না। এর যে বিশাল ব্যাপ্তি, শত জানলেও কতটুকুই বা আমরা জানি।

যেটা না বললেই নয়, ছোট্ট করে বলতে গেলে আত্মীয়তা। শব্দটি হয়তো চার অক্ষরের কিন্তু এর ব্যাপ্তি বিশাল। কিরকম, সেটাই এখন বলব -

রেলফ্যান তো শুধু আমি একা নই, প্রচুর মানুষই আছেন যারা রেলকে ভালোবাসেন তাকে অনুভব করেন। ট্রেনের ছবি হয়তো এখন ফেসবুকে কিংবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করলাম। লাইক, কমেন্টস অনেক মানুষ করবেনই। সেই সূত্রেই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আর ভার্চুয়াল বন্ধুত্বের আরম্ভ। ক্রমে ক্রমে এই ভার্চুয়াল সম্পর্ক কখন যে আত্মীয়সম সম্পর্কে পরিণত হয় তা বুঝতে পারিনে। একই পেটের ভাই বা দাদা না হলেও আপন ভাই কিংবা দাদার চেয়ে সেই সম্পর্ক কম হয় না। বাড়ির যেকোনো অনুষ্ঠান, ভ্রমন, আড্ডা কিংবা যেকোন বিষয় নিয়ে আলোচনা সবকিছুতেই আমাদের অবাধ বিচরণ। আর এটা শুধু নিজের এলাকাকেন্দ্রিক নয়, পুরো দেশ কিংবা বিদেশ জুড়েও। ধরুন ট্রেনে করে প্রথম বার চেন্নাই গেলাম। স্টেশনে

নেমে সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো রেলগ্রুপে অথবা পার্সোনাল টাইমলাইনে শুধু পোস্ট করলাম-- "Any Railfan there?? I am now at Chennai Station." বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, ঠিক কোনো না কোনো রেলফ্যান রেসপন্স করবেই। তারপর একসাথে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া এবং অতি অবশ্যই রেলফ্যানিং তো আছেই। ভাষা সেখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। দুই অক্ষরের 'রেল' শব্দটির কতটা প্রভাবতা সত্যিই আমরা ধারণা করতে পারি না। আমাদের প্রানের রসদ আমাদের নিখাদ ভালোবাসার প্রতীক এই রেলওয়েজ।

পাগলামি কাকে বলে জানেন? বিভিন্ন সময়ে রেলওয়ে প্রশাসন রেলকেন্দ্রিক বিভিন্ন পূর্তি পালন করে। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ থাকলে তো কথাই নেই আনন্দে-বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে যেতে হয়। অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে হয়তো দেখলাম বিশাল দানবীয় লোকোমোটিভটি দাঁড়িয়ে আছে। পরম উৎসাহে ফুল দিয়ে তাকে সাজাচ্ছি আমরা। কখনও তাকে মনের সুখে স্পর্শ করে অনুভব করছি কিংবা তার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন পোজে ফটো তোলা। উফফ ভাবলেই জাস্ট গায়ে কাঁটা দেয়। কারন সাধারণের চোখে হয়তো ইঞ্জিন কিংবা রেকগুলো একটা যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু আমাদের কাছে এরা আমাদের হৃদয়ের একটি অংশ। হয়তো বাক্য বিনিময় করতে পারে না হয়তো কোনো অনুভূতি নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন এই "জড়" বস্তুটিই যখন ট্র্যাক কাঁপিয়ে ছুটে চলে তীব্র হর্ন বজায় কিংবা হেডলাইটের তীব্র আলোর ঝলকানিতে সামনের পথ ইঞ্জিনের 'হামিং' সবটাই আমাদের কাছে যন্ত্রের অভিব্যক্তি নয় সেটা ভালোবাসার অভিব্যক্তি।

বিশ্বজুড়ে কোভিড মহামারীর কারণে আমাদের দেশে কিছু অংশ বাদে অধিকাংশ রুটেই আমাদের লাইফলাইন অর্থাৎ লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ। কিন্তু তা বলে কি আমাদের রেলফ্যানিং বন্ধ থাকবে! 'নৈব নৈব চ'। আমার সেকশনেরই কিছু কথা বলি। থাকি আমি শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখার অশোকনগর স্টেশনে। লোকাল ট্রেন ছাড়াও আন্তর্জাতিক ট্রেন হিসেবে বন্ধন এক্সপ্রেসের গমনপথ এই শাখা। প্যানডেমিকের কারনে আজ সবই বন্ধ। চলছে গুটিকয়েক স্টাফ স্পেশাল ট্রেন আর প্রচুর সংখ্যক মালগাড়ি। বিভিন্ন শেডের ইঞ্জিনের ঘোরাফেরা এখন আমাদের এই সেকশনে, যা ডিউটি করতে করতে দুচোখ ভরে দেখি। আর তাদের প্রেমে নিজেকে নিমজ্জিত করি। বস্তুত, মালগাড়ি-লাইট ইঞ্জিনের চলাচলের কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে না। কিন্তু তাও আমরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকি কখন ইঞ্জিন কিংবা মালগাড়িটি আমার স্টেশনে আসবে। আমি দুচোখ ভরে দেখবো সেটাই চর্মচক্ষে অথবা ডিজিটাল লেন্সে। কত দিন এমনও হয়েছে নাইট ডিউটি করে ক্লান্ত দেহে সবে বাড়িতে এসেছি হঠাৎ আপডেট পেলাম একটু পরেই আমার হোমস্টেশনে মালগাড়ি আসবে। ব্যাগ কাঁধে নিয়েই আবার তড়িঘড়ি ছুট স্টেশনের দিকে। কারন, মালগাড়ি দেখবো। আবার নাইট করেও বাড়ি যাইনি শুধুমাত্র এই রেলফ্যানিংয়ের জন্য। ক্ষমা করুন আমায়, এই অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না। মালগাড়ি কিংবা ইঞ্জিনের নেই কোনো অনলাইন ট্র্যাকিং পদ্ধতি, নেই কোনো রিয়েল টাইম লোকেশন জানার মাধ্যম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা ঠিক খবর পেয়ে যাই কোন স্টেশন ছাড়লো ট্রেনটি কিংবা কোন শেডের লোকোমোটিভটি আসছে। এতটাই স্ট্রং রেলফ্যানিংয়ের নেটওয়ার্ক। এখন স্টাফ স্পেশাল চলাচল করছে, রেলের নিয়মানুযায়ী সাধারণ যাত্রীদের এই ট্রেনে ওঠা নিষেধ। তাই বলে কি ট্রেনস্পটিং থেমে থাকবে! কদাচিৎ নয়। প্রচন্ড ভিড় সহ্য করে, সর্বোপরি করোনার ভয়কে উপেক্ষা করে নিজের গাঁটের কড়ি খসিয়ে চলে যাই দূর দূরান্ত স্টেশনে। পরিশ্রম তো অবশ্যই কিন্তু পরম কাঙ্খিত ট্রেনকে দেখলেই সেই পরিশ্রমের কষ্ট নিমেষেই লাঘব হয়ে যায়। এমনই এক দুর্বার আকর্ষণ।

নিজেদের বড়াই করছি না, তবে আমি হলফ করে বলতে পারি, আমাদের মধ্যে কিছু রেলপাগল যা জানে অনেক রেলকর্মীরাও তাদের জানার ধারেকাছে দিয়ে যাবে না। আমি নিজেও একজন রেলকর্মী, কিন্তু তাও স্বীকার করছি অনেক রেলকর্মী যেটুকু জানেন, সেটা তার কর্মক্ষেত্রের সৌজন্যেই, তার বেশি নয়। কখনো কখনো আমাদের সাধারণ মানুষ, রেল কর্মচারী কিংবা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে হেনস্থা হতে হয় কিন্তু তাতে যদি আমাদের একটুও দমানো যায়। ব্যতিক্রম ও আছে। অনেক রেলকর্মীরা ব্যাপারটিকে বুঝতে চেষ্টা করেন, উৎসাহ দেন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সেইসব রেল কর্মচারীদের যারা রেলপাগলদের অনুভূতি গুলো একটু হলেও বোঝে বা অনুধাবনের চেষ্টা করে।

জানি আমার এই লেখা পড়ে অনেকে আমার এখনই রাঁচি যাওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক বসাবে। হলফ করে বলতে পারি, সেটা অবশ্যই সাধারণের চোখে। কিন্তু আমার তাতেও বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, কারণ রাঁচি গেলেও সেই হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী কিংবা অন্য ট্রেন এবং বিভিন্ন রকমের ইঞ্জিন। সুতরাং আমি সানন্দে রাঁচি যেতে রাজি।

রেলফ্যানিং ছিল, আছে এবং থাকবে । রেলওয়ে এর প্রতি ভালোবাসা আমাদের বাড়বে বই কমবে না। রেলফ্যানিং যুগ যুগ জিও !!!

রেলের চাকায় বিহুর দেশে...

কৌস্তভ চৌধুরী

"অনুগ্রহ কবি মন কবিব ১২০৬৭ উজনিম গুয়াহাটী --> যোবহাট টাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেছ ক্ষন্তেক পিছতে ৩ নম্বব প্লটফর্মব পবা এবিব"। (অনুগ্রহ করে শুনবেন ১২০৬৭ আপ গুয়াহাটি --> যোরহাট টাউন জনশতব্দী এক্সপ্রেস কিছুক্ষন পরেই ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে)।

নির্ধারিত সময়েই গুয়াহাটি থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়ল, সকাল ৬ টা বেজে ৩০ মিনিটে। গন্তব্য আপার আসামের যোরহাট, যোরহাট একটি জেলা তথা জেলা সদর। আসামের সংস্কৃতিকে চিনতে ও জানতে চাইলে শুধুমাত্র গুয়াহাটি শহরে বিচরণ করলেই হবে না, সেই সংস্কৃতির খোঁজে যেতে হবে আসাম রাজ্যের অনেক গভীরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভারে পরিপূর্ণ এই রাজ্য। আর এইরূপ এক নৈসর্গিক প্রকৃতির সন্ধানে তথা অসমীয় সংস্কৃতির সাথে নিবিড় হতে রওনা দিলাম প্রকৃতির রানী তথা আসামের আদ্যপ্রান্তে।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম দরজার কাছে, প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এসে আমাদের ট্রেন এঁকে বেঁকে এগোতে থাকলো তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। দরজা দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলে আসা গুয়াহাটি স্টেশনের দিকে তাকিয়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছিলাম। গুয়াহাটি স্টেশনের রেক ইয়ার্ড ও লোকো শেড একদম পাশাপাশি (নিউ গুয়াহাটি), ডান দিকে সেই ইয়ার্ড ও শেডকে রেখে আমাদের জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিল। বামদিকে তাকাতেই নজরে এলো সেই বহু স্মৃতি বিজড়িত আসামের প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র। গুয়াহাটি ছাড়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই কোথায় যেন হারিয়ে গেলো সেই বিশাল জনপদ, মানুষের কোলাহল, বড়ো বড়ো প্রাসাদ সমান বাড়ি। চোখের সামনে এখন শুধুই সবুজ আর সবুজ। সেই সবুজের ফাঁকেই মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে ব্রহ্মপুত্র। আমরা চলেছি এই ব্রহ্মপুত্রের বুকেই অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বক্ষের দ্বীপ মাজুলির উদ্যেশ্যে।

পাহাড়ি রাস্তায় প্রায় ১০০ কিমি প্রতি ঘন্টার গতিবেগে পাড়ি দিচ্ছে গুয়াহাটি থেকে যোরহাট টাউন যাওয়ার ১২০৬৭ আপ জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, যার নেতৃত্বে রয়েছে ভারতীয় রেলের শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন ডব্লিউ.ডি.পি -৪ডি। ট্রেনের অন্দরের সাজসজ্জা যথেষ্ট নজরকাড়ার মতো, অসমের সংস্কৃতি বিহু নাচ ও বিশেষ কিছু দর্শনীয় প্রতীক যেমন- মা কামাখ্যা মন্দির, কাজিরাঙা অভয়ারণ্য, চা-বাগান, গড়ার ইত্যাদিরও বেশ কিছু ফ্রেমে বাঁধানো ছবি স্থান পেয়েছে ট্রেনের কামরার ভেতরে। ডান দিকে সু-উচ্চ পাহাড় ও বাম দিকে ব্রহ্মপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রকৃতির বুক চিরে এগিয়ে চলেছে ট্রেন। বেশ কিছু ছোটো ছোটো স্টেশন যথা নুনমাটি, নারঙ্গি, পানিখাইতি, পানবাড়ী, কামরূপ খেত্রী ইত্যাদিকে পেছনে ফেলে ট্রেন তার যাত্রা পথের প্রথম বিরতি দিলো চাপরমুখ জংশনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিলঘাট টাউন যাওয়ার ট্রেন এইখান থেকেই পাওয়া যায় এবং আলিপুরদুয়ার থেকে শিলঘাট টাউন যাওয়ার "রাজ্যরানী এক্সপ্রেস" এই স্টেশন হয়েই নগাঁও এর দিকে ঘুরে যায়। স্টেশনটি খুব বড়ো না হলেও বেশ জনমানব পূর্ন। স্টেশনটিতে বিক্রিত দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ আকর্শন ছিল কল,

ছবিঃ কৌস্তভ চৌধুরী

এবং রবাব ট্যাঙ্গা। কাতি বিহু (কার্তিক মাসে এই উৎসব হয় বলে এইরূপ নামকরণ) উপলক্ষে রবাব ট্যাঙ্গার চাহিদা খুব বেশী, কারণ আসামের উৎসব কাতি বিহুতে রবাব ট্যাঙ্গা একটি অপরিহার্য ফল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অসমীয়া ভাষায় "কলা" কে বলে "কল" এবং "বাতাবি লেবু" কে বলে "রবাব ট্যাঙ্গা"। ট্রেন ছাড়লো, পরবর্তী স্টপেজ হোজাই।

আমি বেশ অনেক্ষন ধরেই ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ছবি তোলার অপেক্ষায় রয়েছি, কিন্তু ঠিক সুযোগ হয়ে উঠছিল না। কারণ বোরো জঙ্গীদের উৎপাতের জন্য এই রেলযাত্রায় রেলপুলিশের টহলদারীটা একটু মাত্রাতিরিক্ত। রেলপুলিশ দের কড়া চোখের শাসন আমায় বুঝিয়ে দিল আমি যেন কোনো ভাবেই ছবি তোলার সাহস না দেখাই, অগত্যা ক্যামেরাটা খোলসে পুরে আর চোখকেই লেন্স করে মনের হার্ডডিস্কে স্টোর করছিলাম প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের ক্যানভাস।

শরতের নীল আকাশে পেঁজাতুলোর মতো মেঘ, সাথে সবুজের সমারোহ - ঈশ্বর এখানে দু হাতে ঢেলে সাজিয়েছেন প্রকৃতিকে। এখানকার আকাশ ঘন ঘন তার রূপ পরিবর্তন করে চলেছে। সবুজেরও এখানে রঙের বাহার, কোথাও গাঢ় তো কোথাও হালকা আবার কোথাও সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে হালকা হলুদের ছোঁয়া। সত্যি কথা বলতে কি এই রূপ মাধুর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। আসামের এই

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

ছবিঃ কৌস্তভ চৌধুরী

অপরূপ প্রকৃতির প্রতি আমার বরাবরই একটা দূর্বলতা আছে, এই রাজ্যের ভাষা, সংস্কৃতি সবকিছুই আমাকে ভীষণ রকম আকৃষ্ট করে, মনে হয় কোথায় যেন এক অদৃশ্য বন্ধন এক অদৃশ্য ভালোবাসা রয়েছে। এখানকার প্রকৃতি ও মানুষের ব্যবহারে পূর্ববঙ্গের (আমার প্রিয় বাংলাদেশ) একটা ছোঁয়া পাওয়া যায়। এখানকার আকাশে বাতাসে এক গভীর আন্তরিকতা আছে, আমি সত্যি সেটা অনুভব করি।

বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে আর যথারীতি আমার পেটে ছুঁচোর ডন বৈঠক শুরু হয়ে গেছে, ট্রেনটিতে প্যানট্রি কার নেই কিন্তু অনবোর্ড প্যানট্রি আছে, সেখান থেকেই কিনে ফেললাম ব্রেড-ওমলেট-কাটলেট। উফফ, গরম গরম ওমলেট ও কাটলেট ব্রেডের সাথে, কি যে সুস্বাদু সে আর কি বলবো, সাথে আবার "গরমা গরম চায়ে"। আসলে ভ্রমণ মানেই বাঙালী, আর বাঙালী মানেই ভোজন, তাই যেখানে বাঙালী থাকবে সেখানে ভ্রমণ ও ভোজন থাকবে না তাই আবার হয় নাকি? খাওয়া দাওয়া সারতে সারতেই পৌঁছে গেলাম হোজাই। চারিদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে ছোট্টো একটি স্টেশন। এখানে বিক্রিত দ্রব্যাদির মধ্যে অন্যতম হলো মৎস্য, আজ্ঞে হ্যাঁ সবাই ঠিকই বুঝেছেন আপামর বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ। বালতিতে জলের মধ্যে মাছ নিয়ে হকারেরা ট্রেনে উঠে মাছ বিক্রিতে ব্যাস্ত, ক্রেতাদের মধ্যে যেমন সাধারণ যাত্রীরা আছেন ঠিক সেইরকমই রয়েছেন রেলপুলিশ, টিকিট পরীক্ষক এবং লোকোপাইলট। লোকোপাইলট তো রীতিমত দরদাম করে কিনে ফেললেন ২ কেজি মাছ। ট্রেন ছেড়ে আবার স্বমহিমায় গতি চরমে তুলে চড়তে শুরু করলো পাহাড়ে। পাহাড় খুব উঁচু না হলেও এখানে পথ যথেষ্ট চড়াই উৎরাই, পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ- কোথাও পাইন, কোথাও ফার্নের জঙ্গল কোথাও আবার গোলমরিচের লতানো গাছ কোনো এক বৃহৎ বৃক্ষকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, আবার কোথাও শুধুই নাম না জানা গাছের বাহার।

আবার কেমন যেন খিদে খিদে পাচ্ছে, সাথেই ছিল কেক ও ম্যাংগো জুস, কিছুটা পেটেপুরে পেট টাকে শান্ত করলাম। আসলে ট্রেন যাত্রা আর তার সাথে টুক টাক খাওয়া নাহলে কি চলে? ট্রেন যেমন চলছে ঠিক সেইরকমই মুখটাকেও চালাতে হবে। ট্রেনে হকারদের আনাগোনা চলছে, যার মধ্যে প্রধান হলো আসামের পান-তাম্বুল(সুপারি)। সাথে মশলা মুড়ি, ডিম সিদ্ধ ইত্যাদিও মজুত। গোটা কয়েক ডিম সিদ্ধও গলাধঃকরণ করলাম, তবে পান-তাম্বুল খাওয়ার সাহস হোলো না, পাছে মাথা ঘুরে বমি হয়। বাইরের হাওয়াটাও যথেষ্ট আরামদায়ক, বেশ একটা ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ। ট্রেন গোটা যাত্রাপথে খুব কম সময় সোজা পথে চলে, না হলে বাকি পথে লোকোপাইলট কখনোই সোজা তাকিয়ে থাকতে পারেন না। পুরো রাস্তাটাতেই

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

জঙ্গলের ভেতরে পাহাড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে সরীসৃপের মতো এগিয়ে চলেছে জনশতাব্দী। এরই ফাঁকে রেলপুলিশের চোখ এড়িয়ে চলভাষ যন্ত্রে কয়েকটা বাইরের অপরূপ মুহূর্ত খিঁচিক করে রেখেছি। পরের স্টপেজ লংকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই, আর পাঁচটা ছোটো স্টেশনের মধ্যেই একটু বড়ো স্টেশন। ট্রেন ছেড়ে এগিয়ে চললো পরবর্তী স্টপেজের দিকে।

ট্রেন এসে পৌছালো লামডিং জংশনে। এই পথের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন এটি। লামডিং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশন। মোট ৫ টি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এই জংশন স্টেশনটিতে। আগরতলা এবং শিলচর যাওয়ার জন্য এইখানেই ট্রেন বদল করতে হয়, যদিও কলকাতা / দিল্লী প্রভৃতি জায়গা থেকে সরাসরি আগরতলা ও শিলচর যাওয়ার ট্রেন বর্তমানে হয়েছে। স্টেশনটি যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখান থেকে ট্রেনে বেশ ভালোই লোকজনের ভীড় হলো। ট্রেনের সমস্ত কামরাই সংরক্ষিত, তথাপি ট্রেনে বেশ উটকো লোকের ভীড় লক্ষ্য করা যায়। এই রেলপথে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রেন না থাকার দরুন, এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় যাত্রা করা ছাড়া এইসব মানুষ গুলোর আর কোনো উপায় নেই। তাই টিকিট পরীক্ষকরাও ওইসব মানুষ গুলোর কথা চিন্তা করে সব দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন। বেশ কিছু স্থানীয় সুস্বাদু খাবার নিয়ে হকাররা এখান থেকে ট্রেনে উঠলো, যার

ছবিঃ কৌস্তভ চৌধুরী

মধ্যে প্রধান ছিল পুরী-সব্জি এবং ছোলা মাখা। ছোটো ছোটো শালপাতার বাটিতে ছোটো ছোটো পুরী ৪ পিস করে আর সাথে সব্জী, পেঁয়াজ, বাঁশের আচার-- আহা মুখে স্বাদটা এখনো লেগে আছে। লোভে পরে আমি দু প্লেট খেয়েই নিলাম। সাথে ছিল ছোলা মাখা, মানে আগের দিন রাত্রের জলে ভিজিয়ে রাখা ছোলা গরম করে মশলা, পেঁয়াজ ও লেবু সহকারে মেখে শালপাতায় পরিবেশন। পেট ভর্তি কিন্তু মন যে নয়, ভাবছি খাবো কিনা! সাধ ও করে আবার মন ও পোড়ে, তাই আর বেশি চিন্তা ভাবনা না করে ১০ টি টাকা বার করে কিনেই ফেললাম, একটু মুখে পুড়ে স্বাদ আস্বাদন করে বুঝলাম ১০ টি টাকা জলে যায়নি। এই ট্রেন যাত্রায় খাদ্য রসিক বাঙালীদের মুখ নাড়ানোর কোনো সমস্যা হবে না। সেইসব খাবার খেতে খেতেই ট্রেনের যাত্রা উপভোগ করছিলাম। সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে প্রচুর নাগা ও মনিপুরী যাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ছোট্ট নাগা ও মনিপুরী শিশুর নিষ্পাপ মুখ ভোলার নয়। পাহাড় শেষে এখানে বেশ কিছু ধানী জমি চোখে পড়লো। সবচেয়ে বড়ো জিনিস গোটা যাত্রা পথে একঘেয়ে লাগার কোনো জায়গা নেই।

লামডিং এর পরবর্তী স্টেশন দিফু। নিতান্তই ক্ষুদ্র একটি স্টেশন তথাপি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ এইখানে রয়েছে। স্টেশন ক্ষুদ্র হলেও জায়গার গুরুত্ব যথেষ্ট, এইখান থেকেই নগাঁও এবং ডিমাপুর হয়ে নুমিলীগড় যাওয়ার সড়ক যোগাযোগ আছে, এইখান থেকে ১২৯ নম্বর জাতীয় সড়কের রাস্তা ধরে খুব সহজেই নাগাল্যাডে পৌঁছনো যায়। দিফু থেকে ট্রেন ছেড়ে এগিয়ে চললো গন্তব্যের দিকে, আমরাও এবার আসাম রাজ্য ছেড়ে প্রবেশ করলাম ভারতের আরেক রাজ্য নাগাল্যাডে। আমরা এখন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে আনুমানিক ১৫০ কিমি দূরত্ব বজায় রেখে চলেছি। ব্রহ্মপুত্র এবং আমাদের রেল পথের মাঝে রয়েছে বিশ্ব বিখ্যাত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান। গুয়াহাটি থেকে যোরহাট যাওয়ার সড়ক পথ কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়েই গেছে, সড়ক যাত্রায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে অনেক সময় দেখা মেলে কাজিরাঙার বন্য প্রাণীদের। এছাড়াও রয়েছে অসমের স্বতন্ত্র জেলা কারবি আঁলং (কাববি আলং), "কারবি" বলাহয় আসামের একধরনের আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের আর "আঁলং" কথার অর্থ পাহাড়। এই কারবি আঁলং অঞ্চলটি বিশ্বের উৎকৃষ্ট মানের জৈব আদা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

"অনুগ্রহ কৰি মন কৰিব ১২০৬৭ উজনিম গুয়াহাটী --> যোৰহাট টাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেছ ৰেলগাড়ী খন এতিয়া ১ নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা বৈয়াসে"--

খুবই কৌতূহলী ছিলাম যে ডিমাপুর স্টেশনের মাইকের ঘোষণা কিরকম হবে! লক্ষ্য করলাম এখানেও ঘোষণার সময় আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে অসমীয়া ভাষাকেই ব্যবহার করা হয়। খুব বড়ো না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন স্টেশন ডিমাপুর। নাগাল্যান্ড বলতে আমাদের মনে প্রথমেই যে ছবিটি ভেসে ওঠে সেটা হলো আদিবাসী-পাহাড়-জঙ্গল। কিন্তু ডিমাপুর একেবারেই সেইরকম নয়। যথেষ্ট সাজানো গোছানো আর পাঁচটা বড় শহরের মতোই একটি জনবহুল শহর এই ডিমাপুর। এইটি পূর্বে নাগাল্যান্ডের রাজধানীও ছিল। নাগাল্যান্ড রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুন এই রাজ্যে রেল পথের বিস্তার খুবই কম, তাই সবে ধন নীল মণি এই ডিমাপুর স্টেশন। স্টেশন যথেষ্ট ঘিঞ্জি ও অপরিষ্কার কিন্তু স্টেশন সংলগ্ন রেলের ছোটো ছোটো কোয়ার্টার গুলো খুবই চোখে পরার মতো, ফুলের বাগান সহ বেশ সাজানো গোছানো। স্টেশনের রেল লাইনের গায়েই লাগানো সব্জী বাজার। সেই বাজারে বিভিন্ন ধরনের সব্জীর মধ্যে মাশরুম, স্কোয়াশ, ছোটো ছোটো আলু অনেকটা রাজমার মতো দেখতে, গাঁঠি কচু এইসব বেশ জনপ্রিয়।

ট্রেন পুনরায় সঠিক সময় সারণী মেনে তার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলো, কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রকৃতির আরেক নতুন রূপের সাথে পরিচিত হলাম, চোখের সামনে সবুজ ধানক্ষেত আর তারপরেই মেঘে ঢাকা সুউচ্চ পর্বত। সেই পর্বতের শিখর যেন চুম্বন করছে ওই নীল দিগন্তকে। এই অপরূপ রূপ মাধুর্য্য দেখে আমারও কবির ভাষায় গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো --

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

"এত স্নিগ্ধ নদী কাহার,
কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র,
আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস কাহার দেশে।"

সত্যিই সহস্র প্রদীপ হাতে নিয়ে খুঁজলেও আমার দেশের মতো আরেকটি দেশ কোথাও পাওয়া যাবেনা। আমার দেশ আমার জন্মভূমি সে সত্যিই সকল দেশের রানী।

পরবর্তী স্টপেজ বোকাজান। এই স্টেশনটি আসাম রাজ্যে অবস্থিত এবং বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল। এর মধ্যেই আমাদের ট্রেন নাগাল্যান্ড ছেড়ে পুনরায় আসাম রাজ্যে

ছবিঃ কৌস্তভ চৌধুরী

প্রবেশ করেছে। বোকাজান স্টেশনে নেমে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় নাম্বর রিজার্ভ ফরেস্টে, অসমীয়া ভাষায় যাকে বলে নাম্বর-হাবি-- "হাবি" শব্দের অর্থ "জঙ্গল"। মা দূর্গার পবিত্র মন্দির দেব পানি (দে পানি) যেতে গেলে বোকাজান স্টেশনে নেমেই যেতে হয়, কথিত আছে চা বাগানের মধ্যে ১৯২৭ সালে তৈরী হওয়া এই মন্দিরটি খুবই জাগ্রত। এই স্থানে পবিত্র মনে মনস্কামনা জানিয়ে মায়ের আরাধনা করলে, মা নাকি তাঁর কোনো ভক্তকেই নিরাশ করেন না।

বোকাজানের পরের স্টপেজ ফারকাটিং জংশন। বোকাজান থেকে ফারকাটিং পর্যন্ত ট্রেন গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়েই যাত্রা করলো, এবং পথে এলিফ্যান্ট করিডোরও চোখে পড়লো, ফলে এইখানে ট্রেনের গতি ৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় বেঁধে দেওয়া আছে। এইখানে ক্রসিংয়ের জন্য ট্রেন অনেকখন দাঁড়ালো। স্টেশনটিতে দুইটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম, আমাদের জনশতাব্দী এক্সপ্রেসকে প্ল্যাটফর্ম বিহীন একটি লুপ লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখেদিলো। এইখানে নিউ তিনসুকিয়া-রঙ্গিয়া এক্সপ্রেসের সাথে ক্রসিং হোলো আমাদের ট্রেনের। সিঙ্গেল লাইনের জন্য এই যাত্রাপথের অনেক স্টেশনেই ক্রসিংয়ের জন্য বিলম্ব হয়। ফারকাটিং থেকে একটি রেল পথ আলাদা হয়ে গোলাঘাট, নুমিলীগড়, যোরহাট টাউনের পথে ঘুরে মরিয়ানী জংশনে গেছে, আর প্রধান রেল পথটি সরাসরি মরিয়ানী জংশনে গেছে। এই ফারকাটিং স্টেশনে হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম রেলপুলিশরা প্রতিটি কামরায় উঠে খানা তল্লাশি চালাচ্ছে, বেশ কিছু যাত্রীদের

ছবিঃ কৌস্তভ চৌধুরী

যারা টুরিস্ট ছিলাম তাদের কাওকেই ওনারা বিরক্ত করেননি। কয়েকজন সন্দেহ জনক মানুষকে ট্রেন থেকে ওঁরা নামিয়ে নিলো। সন্দেহ জনক মানুষগুলোকে কেন ট্রেন থেকে নামালো অথবা এরপর ওদের নিয়ে কি করবে জানা নেই! আমার কৌতূহলী মনে হাজার প্রশ্নের ঝড় উঠলো।

ট্রেন ছেড়ে দিলো। আমি বেশ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম ধরাপড়া সেইসব মানুষ গুলোর মুখের দিকে। ট্রেন ডান দিকে বাঁক নিয়ে গতি বাড়াতেই আস্তে আস্তে আবছা হয়ে এলো সেই সব মুখ। বাতাসে ডিজেলের পোড়া গন্ধ - আকাশে ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া, হঠাৎ করে এই সুন্দর মনোরম পরিবেশটাকে কিরকম যেনো একটা গুমোট করে তুলেছিল। বাকী রাস্তায় আমার অনেকবার ওইসব মানুষ গুলির মুখ মনে পড়ছিল যাদের পুলিশ ধরপাকড় করেছিল। মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা উত্তেজনাকে আর চেপে না রেখে কর্মরত একজন মহিলা রেলপুলিশ কর্মীকে ওই সব ধরা পড়া মানুষ গুলোর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম। উনি জানালেন এই অঞ্চলটাতে ভীষণ রকম বোরো জঙ্গীদের উৎপাত, তাই কোনো রকম সন্দেহ জনক কাউকে দেখলেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হঠাৎ করে মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেলো, ভাবছিলাম কারা এই বোরো জঙ্গী? কেনই বা এরা এই সুন্দর দেশ আসাম কে অশান্ত করে তুলেছে? কেন তারা আসাম থেকে আলাদা হতে চায়? কেনই বা তারা এই সুন্দর প্রকৃতির রানীকে ভেঙে আলাদা রাজ্য করতে চায়? আসাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, মেঘলায় কেন এই সব রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে? এরা কি সত্যি বোঝে না প্রকৃতির আর্তনাদ! প্রকৃতি যে চিৎকার করে বলছে তাকে রক্তাক্ত না করতে, সে আর এই যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছে না। ঈশ্বরের এই অপার সৃষ্টি, সেটা ধ্বংস করার অধিকার আমাদের কারোর নেই। আসাম একা এতটা সুন্দর হতে পারবে না, যতক্ষন না লোয়ার আসাম, আপার আসাম ও বোরো ল্যান্ড একত্রিত হয়ে আসাম রাজ্য না হবে। আমার এইসব ভাবনার মাঝেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে ট্রেন পৌঁছালো তার গন্তব্যের শেষ পর্যায়ে, স্টেশনের নাম মরিয়ানী জংশন।

এই শেকশনের আরো একটি বড়ো জংশন স্টেশন, তিনসুকিয়া হয়ে ডিব্রুগর যাওয়ার লাইন এবং যোরহাট যাওয়ার লাইন এইখান থেকেই দুই ভাগে ভাগ হয়ে আলাদা হয়েছে। ডানদিকে ডিব্রুগর যাওয়ার লাইন আর বামদিকে যোরহাট যাওয়ার। মরিয়ানী স্টেশনে লক্ষ্য করলাম অনেক মহিলা রেলকর্মী তাদের নিত্য কাজে ব্যস্ত। তাঁরা আমাদের ট্রেনের জলের ট্যাঙ্কে জল ভরে দিচ্ছেন।

৭ ঘন্টার দীর্ঘ যাত্রাপথের অন্তিম স্টেশন যোরহাট, মরিয়ানী থেকে মাত্র ১৮ কিমি দূরত্বে অবস্থিত আসামের এই শহর, এইবার ট্রেন এগিয়ে চললো চা বাগানের মাঝখান দিয়ে। চা বাগানটির নাম "টোকলাই টি এস্টেট"। চা বাগান পার করার পর ট্রেন এগিয়ে চললো বেশ জনবসতি পূর্ন এলাকা দিয়ে, আসাম স্টাইলে তৈরী ছোটো ছোটো কটেজ, খুবই সাজানো গোছানো প্রতিটি বাড়ি। অবশেষে ট্রেন পৌঁছালো তার শেষ স্টেশন যোরহাট টাউনে। দুইটি প্ল্যাটফর্ম বিশিষ্ট ছোট্ট কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্টেশন এই যোরহাট টাউন। ট্রেন এখানে পৌঁছালো ঠিক দুপুর ১ টা বেজে ১০ মিনিটে, তার নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগেই। আবার দুপুর ২ টো বেজে ৩০ মিনিটে এই ট্রেনটি রওনা দেবে গুয়াহাটির উদ্যেশ্যে।

খুবই সুন্দর এক ট্রেন যাত্রার সাক্ষী থাকলাম আমি, যাত্রাপথের প্রতিটি মুহূর্ত বন্দী হয়ে আছে আমার মনের গিগাবাইটে। আমার মনের ক্যানভাসে এই রেল যাত্রা স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন।

শুনেছি ভারতীয় রেলওয়ে কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামী দিনে ডিজেল ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনই চালাবেন। কিন্তু যদি সত্যিই এটা হয়, তাতে হয়তো অর্থনৈতিক দিকে ভারতীয় রেল উপকৃত হবে ঠিকই কিন্তু প্রকৃতি ও রেল প্রেমীরা বঞ্চিত হবেন সৌন্দর্য্য থেকে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল এবং ডিজেল ইঞ্জিন যেন একে অপরের পরিপূরক, চড়াই উৎরাই পথে ডিজেল ইঞ্জিনের সেই ছন্দ তোলা আওয়াজ, তার সেই গুরুগম্ভীর ডাক, মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছেড়ে জানান দেওয়া আমি পরিশ্রমী, তাইতো এই পাহাড়ী দূর্গম পথকেও আমি ডরাই না, আমি সক্ষম তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। তাই উত্তর পূর্ব সীমান্তে এই রেলপথ থাকবে, থাকবে এই রেলযাত্রা, এই সুন্দর প্রকৃতি, কিন্তু আগামী দিনে হয়তো থাকবে না এই ডিজেল ইঞ্জিন। আগামী দিনে কোনো একদিন সেই ডিজেল ইঞ্জিন আমাদের উদ্যেশ্যে বলবে তোমরা আমায় ভুলে গেলেও, আমি তোমাদের ভুলিনি, আমি আজও প্রস্তুত ওই দূর্গম পাহাড়ী রাস্তায় পাড়ি দিতে।

লেখক বলেছেন "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে", ঠিক সেইরকম ভাবেই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলে ডিজেল ইঞ্জিনের শোভা এক অদ্ভুত এবং অকল্পনীয়, যা চলে গেলে শ্রী হারাবে এই রেলপথ। যতই আসুক নিত্য নতুন প্রযুক্তি, যতই আসুক ওই পি-৫, পি-৭ কিন্তু অ্যালকো, ই.এম.ডি এর অবদান ভোলা অসম্ভব, ভোলা অসম্ভব তাদের ওই পাগল করা গর্জন, তাদের ওই দাপটের সাথে গোটা ভারতীয় রেলের ওপর শাসন। ডিজেল ইঞ্জিন চির জীবন তুমি বেঁচে থাকবে প্রতিটি রেল প্রেমীর হৃদয়ে।।

প্রচ্ছদ ছবিঃ শুভদ্যুতি বোসের সৌজন্যে।

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

সুবর্ণ জয়ন্তীতে ভালবাসার
কলকাতা রাজধানী

ঐশিক ভট্টাচার্য

১৯৬৯ সালের ৩রা মার্চ তিলোত্তমা শহর কলকাতার প্রধান স্টেশন হাওড়া থেকে ভারতের রাজধানী শহর দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলো ভারতবর্ষের প্রথম এলিট শ্রেণীর সুবিধাযুক্ত সম্পূর্ণ বাতানুকূল ও অন্যতম দ্রুতগতির ট্রেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উল্লেখযোগ্য শহরের সাথে দেশের রাজধানী শহর দিল্লির দূরত্ব স্বল্পায়িত করার জন্যই চালু করা হয়েছিলো এই বিশেষ ট্রেন। রাজধানী শহরের সাথে যোগাযোগ হওয়ার দরুন ট্রেনের নামকরণ করা হয়েছিলো রাজধানী এক্সপ্রেস। বর্তমানে ২৪ জোড়া রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লির সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে।

২৪ জোড়া রাজধানী এক্সপ্রেসের মধ্যে হাওড়া নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস ছিলো ভারতের প্রথম রাজধানী এক্সপ্রেস। প্রথমে সপ্তাহে মাত্র দুই দিন চলাচল করতো এই ট্রেন। পরবর্তীতে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে দ্বিসাপ্তাহিক থেকে পরিবর্তীত হয়ে বর্তমানে ১২৩০১/০২ নম্বরে ৬ দিন এবং ১২৩০৫/০৬ নম্বরে ১ দিন অর্থাৎ সপ্তাহের প্রতিদিনই হাওড়া স্টেশন থেকে পাড়ি দেয় দিল্লির উদ্দেশ্যে।

দেশের প্রথম এলিট শ্রেণীর ট্রেনের তকমা প্রাপ্ত এই ট্রেন আজ সারা দেশবাসীর কাছে এক আবেগের ও ভালোবাসার ট্রেন। সেই সময়ের পর থেকে শুরু করে সমসাময়িক সময় অবধি ভারতীয় রেলে আবির্ভাব ঘটেছে আরো অনেক এলিট শ্রেণীর সম্পূর্ণ বাতানুকূল গাড়ির। যেমন দুরন্ত এক্সপ্রেস, শতাব্দী এক্সপ্রেস, দ্রুত গতির গতিমান ও তেজস এক্সপ্রেস এছাড়াও নবতম সংযোজন সেমি হাইস্পীড ট্রেন 'Train-18' তথা 'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেস ইত্যাদি। কিন্তু রাজধানীর সেই কৌলিন্যতাকে স্পর্শ করতে পারেনি কেউই। সেই ট্রেনেরই গৌরবময় ৫০ বছর পূর্তি হয়েছিল ২০১৯ সালের ৩রা মার্চ। সেই উপলক্ষে পূর্ব রেলের হাওড়া মণ্ডলের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিলো একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের, যার প্রস্তুতির একটি অংশ হতে পেরে আমি বড়ই আপ্লুত ও গর্বিত। আজকে সেই গল্পই তুলে ধরবো আপনাদের কাছে।

রাজধানী এক্সপ্রেস মানেই গোটা দেশবাসীর কাছে এক আলাদা আবেগের জায়গা এক অন্য অনুভূতি। আর আমাদের মত উন্মাদ রেলপ্রেমীরা যে তার ব্যতিক্রম নই সেটা বলাই বাহুল্য। তার ৬১২৫ অশ্বশক্তির সাদা রাঙা ইঞ্জিন, যার জোরেই কিনা এই ট্রেন, ট্র্যাক কাঁপিয়ে গতির ঝড় তোলে, যার জোরেই আমরা রেলপ্রেমীরা রাজধানীকে ১৩০এর বাদশা নামে ডেকে থাকি সেই ইঞ্জিনকেই যদি সুবর্ণ জয়ন্তী তে নিজের হাতে সাজানোর সুযোগ আসে, তার অনুভূতিটা সত্যি বলতে ভাষায় প্রকাশ করা বড়ই দুষ্কর। ১লা মার্চ বিকেলে যখন চলভাষ যন্ত্রটিতে সেই সুযোগের খবর পেলাম তখন যেন নিজের কানকেই বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। মা' কে খবরটা জানিয়ে বললাম "মা হাতে একটা চিমটি কাটোতো--- উফ্‌ফ্‌।" সম্বিত ফিরে পেলাম আমি। না,

তাহলে স্বপ্ন নয় আমি ঠিকই শুনেছি। আগামীকাল মানে ২রা মার্চ ২০১৯ শনিবার হাওড়ার বামনগাছি বৈদ্যুতিক লোকোশেডে গিয়ে আমাদের প্রিয়, পূর্ব রেলের রাজা, রাজধানী এক্সপ্রেসের সারথি পক্ষীরাজ ঘোড়া ডব্লিউ এ পি - ৭ কে আমি নিজের হাতে সাজাবো। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। রাতটা এক প্রকার নিদ্রাহীন ভাবেই কেটে গেল।

বসন্তের একদম সূচনা লগ্নে ভোর বেলা গুলো বেশ ঠান্ডাই থাকে, ২রা মার্চের সেরকমই ভোরে মাটির ভাঁড়ে ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বসে পরলাম ৫:৫২ মিনিটের শিয়ালদহ গামী লোকালে, গন্তব্য হাওড়া ইলেকট্রিক লোকো শেড। ট্রেনের চাকা গড়াতেই একরাশ ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে চোখ মুখে এক প্রশান্তির স্পর্শ দিয়ে গেল। বাইরের প্রকৃতি তখন কুয়াশায় সাদা চাদর পড়ে আড়মোড়া ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। ঝালমুড়ি ও বাদামওয়ালার হাঁকডাক, নতুন খবরের কাগজের গন্ধ, নিত্যযাত্রীদের গল্প এসব শুনতে শুনতেই রানাঘাট, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, দমদম পেরিয়ে ঠিক সকাল ৮:১০ মিনিটে ট্রেন এসে পৌছালো দেশের অন্যতম ব্যাস্ত স্টেশন শিয়ালদহতে। হাল্কা প্রাতরাশ সেরে ঠিক ৯ টায় পৌঁছে গেলাম হাওড়া ইলেকট্রিক লোকো শেড।

শেড তো রীতিমতো গমগম করছে। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ঝকঝকে হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে সাদা পক্ষীরাজ তথা হাওড়া শেডের ডাব্লিউ এ পি - ৭ #৩০৫৬৮ মা নির্ধারিত হয়েছে শেষ মুহূর্তের কোন ঝামেলাকে এড়াতে, তথা নির্ধারিত ইঞ্জিনের কোনোরকম যান্ত্রিক ত্রুটি হলে পরিবর্ত হিসেবে আরও একটি ডাব্লিউ এ পি - ৭ #৩০৫২৪ কে তৈরি করে রাখা হয়েছিলো। এদিকে লোকোশেডের রেলের স্টাফ দের সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে নেমে পড়েছে আরো রেলপ্রেমী বন্ধুরা রাজধানীর সাদা ইঞ্জিনকে নিজেদের হাতে সাজিয়ে তুলতে। আমিও আর দেরি না করে নেমে পড়লাম কাজে।

কিভাবে সাজানো হবে তা আগে থেকেই রেল আধিকারিকদের সাথে কথা বলে ঠিক করাই ছিল, তাই সেইমতো সাজানো শুরু হয়ে গেল। এ যেন খুব কাছের এক বন্ধুর জন্মদিনের প্রস্তুতি। সময় যত গড়াচ্ছে তত যেন উদ্যম বেড়ে যাচ্ছে, কারোর মধ্যে কোন ক্লান্তি নেই। রঙ বেরঙের ফুলে সেজে উঠছে ধবধবে সাদা পক্ষীরাজ। এইভাবে দুপুর পেরিয়ে কখন যে সন্ধে হয়ে গেছে টেরই পাওয়া যায়নি। অপরদিকে সেজে উঠছে

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ডাব্লিউ এ পি - ৭ #৩০৫২৪, যে কোন রকম প্রতিকূলতাকে এড়াতে।

এভাবেই বেজে গেল প্রায় রাত পৌনে নয়টা। ফুলের তোড়া, গোলাপী জড়ি, নানা রঙের গোলাপ ও গাঁদা ফুলের মালাতে মুখটা যখন সাজিয়ে দেওয়া হলো তখন যেন লাগছে সেজে গুজে বর এইবারে বিয়ে করতে যাওয়ার জন্য তৈরি। সমস্ত কাজ শেষে সাজুগুজু করা সাদা পক্ষীরাজকে তুলে দেওয়া হলো হাওড়া শেডের অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের হাতে, শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা নিরিক্ষার কাজে। আমরাও প্রচুর ছবি, নিজস্বি তুলে রওনা দিলাম বাড়ির পথে। আগামীকাল আবার আসতে হবে তো, এবারে হাওড়া ষ্টেশনে জন্মদিনের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে।

৩রা মার্চ সকাল, টিকিয়াপাড়া কোচিং ডিপোতে তখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। রঙ বেরঙের ভিনাইল ও গাদা ফুলের মালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা রেকটিকে। সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে তৈরি আমাদের আদরের কলকাতা রাজধানী এক্সপ্রেস। জন্মদিনের প্রাক্কালে পূর্ব রেলের রাজা সেজে উঠেছে রাজবেশে।

সকাল সকালই এসে গিয়েছিলাম হাওড়া ষ্টেশনে, কারণ নিয়মমাফিক বিকেল ১৬:৫০ এর বদলে ওদিন তার ছাড়ার সময় নির্ধারিত ছিল দুপুর ২:০৫ । কারণ সাপ্তাহিক ভাবে ট্রেনটি প্রতি রবিবার পাটনা হয়ে দিল্লি যায় এবং দুপুর ২টো ৫ ঘটিকাতেই ছাড়ে আর ৩রা মার্চ ২০১৯ এর জন্মদিনটাও ছিলো সেই রবিবারেই। নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ ৯ নম্বরে পৌঁছে আমি তো অবাক। এ যেন এক মহামিলন উৎসব। রেলপ্রেমী থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যম এছাড়াও ইউটিউব চ্যানেলের মালিকরাও রয়েছে বড়ো বড়ো সব ক্যামেরা হাতে। ভিনরাজ্য থেকেও এসেছেন বহু রেলপ্রেমী ও রেল উৎসাহী মানুষ। আসলে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রতিটি ক্ষনকেই লেন্সবন্দী করতে সকলেই উদগ্রীব। অনেকের সাথে আলাপ করতে করতে প্লাটফর্মে ঢুকতেই দেখি প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। লাল রঙে মুড়ে দেওয়া হয়েছে প্লাটফর্মের ধারটা। সেখানে গোলাপ হাতে ঘড়িতে দেড়টা বাজার কিছু আগে ফুলের মালায় সেজে শান্টিং ইঞ্জিন # ৩৬২২৬ এর হাত ধরে ধীর গতিতে তিনি ঢুকলেন প্ল্যাটফর্মে, পিছনে আমাদের হাতে সাজানো সাদা ইঞ্জিন #৩০৫৬৮। গায়ে যেন অজান্তেই কাঁটা দিয়ে উঠলো এক অন্যরকম আবেগের ছোঁয়াতে। মিথ্যে বলব না মনে মনে ইচ্ছে করছিল যে উঠে এক ট্রিপ দিল্লি ঘুরেই

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

আসি। ট্রেন আসতেই রেলের কর্মীরা লাল গোলাপ, একটি ছোট খাম (যাতে রাজধানী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য রয়েছে) এবং একটি চকোলেট বার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলেন যাত্রীদের স্বাগত জানাতে। যাত্রীদের আগমন শুরু হতেই একে একে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল পূর্ব রেলের রাজার জন্মদিন উপলক্ষে ছোট্ট সেই উপহার। একে একে সব রেলপ্রেমীরা আসতেই শুরু হয়ে গেল নানা দিক থেকে নানা রকম ভাবে ট্রেনের ও ইঞ্জিনের ছবি তোলা, ইঞ্জিনের সামনে বসে গ্রুপ ছবি তোলা, নানা রকম ভাবে দিনটিকে মনের মণিকোঠায় ধরে রাখার প্রচেষ্টা। দুপুর ঠিক ২:০৫ হতেই সিগন্যাল সবুজ হয়ে উঠলো, গার্ড সাহেব বাঁশি বাজিয়ে সবুজ পতাকা উড়িয়ে ট্রেন ছাড়ার অনুমতি দিতেই বেজে উঠলো সাদা ইঞ্জিনের পোঁ..... , লৌহপাতে গড়ালো চাকা, নড়ে উঠলো ট্রেন, ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে ভালোবাসার রাজধানী আমাদের সকলকে বিদায় জানিয়ে অনেকখানি স্মৃতি উপহার দিয়ে এগিয়ে চলেছিলো ভারতের রাজধানীর উদ্দেশ্যে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম রাজার রাজকীয় প্রস্থানের পানে। শেষ কোচের টেললাইটের লাল আলো ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখ ফিরিয়ে নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা আমার বন্ধুর মুখের দিকে চাইতে সবই ঝাপসা লাগলো। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের কোনায় জমে থাকা জল মুছে দৃষ্টি পরিষ্কার করলাম।

তাদের যেন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সেই ১৯৬৯ সালে। মেনুতে ফিরে এসেছিল হারিয়ে যাওয়া ফিস ফ্রাই। একসময়ে বেনফিসের বানানো এই ফিস ফ্রাই ছিল কলকাতা রাজধানীর অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়াও বিকেলের জলখাবার রাতের মেনুতে ছিল অনেকরকম এর জিভে জল আনা রান্নার ভ্যারাইটি। এসি প্রথম শ্রেণি তে খাবার শেষে দেওয়া হয়েছিল সুস্বাদু ক্যারামেল কাস্টার্ড।

কোথাও যেন ট্রেন চলে যাওয়ার পর একটু হলেও কষ্ট হচ্ছিল, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গতকাল থেকে রেলপ্রেমীদের যে মিলন মেলা শুরু হয়েছিল তা যেন হঠাৎ করে ফুরিয়ে গেল। ষ্টেশনে পড়ে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল যা মনে করিয়ে দিচ্ছিল আগেরদিনের ইলেকট্রিক শেডের গোটা দিনটাকে। সবাই তখন বাড়ির পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। কেউ ট্রেন ধরবে, কেউ যাবে বাস স্ট্যান্ডে, কেউ শিয়ালদহ এর পথে। প্রচুর ছবি, অনেক গল্প, অনেক আনন্দের মুহূর্তকে সঙ্গে নিয়ে আমিও বিদায় নিলাম। আর সাথে থাকল জন্মদিন উপলক্ষে বানানো সেই বিশেষ কার্ডটি, যা সারাজীবন এই দিনটিকে মনের মণিকোঠায় ধরে রেখে দেবে।

ভাল থেকো কলকাতা রাজধানী, এভাবেই মানুষের পাশে নিরন্তর ভাবে থেকে, আরোও গৌরবান্বিত হয়ে উঠুক তোমার জয়যাত্রা ।

হাওড়া লোকোমোটিভ শেডের ভেতরে তোলা সমস্ত ছবি, সেখানকার দায়িত্বে থাকা রেল আধিকারিকদের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে তোলা হয়েছে।

প্রচ্ছদ ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরীর সৌজন্যে।

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

মেঘ পিওনের দেশে

রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

বাঙালি মানেই ভ্রমণ পিপাসু। মনে পড়ে ছোটবেলার কথা, বাবার LTC-র সৌজন্যে দেশের যে প্রান্তেই ঘুরেছি সেখানেই ভ্রমণরত বাঙালির খোঁজ পেয়েছি এবং সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে আজও। বেড়িয়েছিলাম পাহাড়ে ঘোরার উদ্দেশ্যে সাথে পাহাড়ি রেল চড়ার লোভটাও ছিল বেজায়। সঙ্গী ছিলেন আমার সহধর্মিণী এবং তাঁর ছিল পাহাড়ের রানী কে দেখার সখ, যা পূরণ করার ভার বর্তেছিল এই অধমের ওপর। মোটামুটি হাতে ৭ দিনের ছুটি নিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পরলাম। হাওড়া থেকে যথাসময়ে লৌহপথগামি রথে চেপে প্রথমে ভারতের রাজধানী এবং তারপর অবশেষে এক সেপ্টেম্বরের সকালে পৌঁছে গেলাম শৈল শহর শিমলার প্রবেশ দ্বার কালকাতে। সেখানে বড় লাইনের দাদাগিরির ইতি এবং ভালোলাগার ছোট্ট পাহাড়ি রেলের হাতছানি।

কালকা স্টেশনে ছোট লাইনের মিষ্টি টয়ট্রেনটির সামনে দাঁড়িয়ে মনটা যেন কোনো এক সুদূর অতীতে চলে গেলো যখন আজ থেকে প্রায় ১২২ বছর আগে ১৮৯৯ সালে দিল্লী-আম্বালা-কালকা রেল কোম্পানি একটি ২' টয়গেজ রেলপথের নির্মাণ শুরু করে। সেই কবেকার কথা ভাবতেই অবাক লাগে এবং আরও আশ্চর্য লাগে যে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রায় ৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইনের নির্মাণকাজ শেষ হয় এবং ৯ই নভেম্বর ১৯০৩ সালে এই ছোট্ট রেলের ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা হয়। যদিও এই রেলপথের প্রস্তাবনা পর্ব এর বহু আগেই শুরু হয়েছিল। ১৮২০ থেকে ১৮৪০এর মধ্যে ব্রিটিশরা শিমলা অঞ্চলকে তাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলে। ফলে এই জায়গার রাজনৈতিক গুরুত্বও কয়েক গুণ বেড়ে যায় এবং এর ফলে রেলপথে সমতলের সঙ্গে সংযোগ তৈরির প্রস্তাব পেশ করা হয় ১৮৪৭ সালেই। অর্থাৎ ভারতে রেল যোগাযোগ শুরুরও ছয় বছর আগে। কিন্তু সেইসময় প্রস্তাবটিকে বিশেষ আমল দেওয়া হয়নি। শিমলা থেকে সুদূর তিব্বত অবধি প্রসারিত গ্র্যান্ড হিন্দুস্তান ও তিব্বত সড়ক নির্মাণই ছিল এই অঞ্চলের প্রথম উন্নয়ন ভিত্তিক কর্মকাণ্ড, যা নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৮৫০এ আর চালু হয় ১৮৫৬ সালে এবং এই সড়ক সম্পূর্ণ ভাবে হাতে তৈরি করা হয়, কোনো মেশিনের সাহায্য ছাড়াই। এরপরে ১৮৮৪ থেকে আবার রেল যোগাযোগের প্রস্তাব নিয়ে নাড়াচাড়ার শুরু। ১৮৯১ তে দিল্লী-আম্বালা রেললাইন কালকা অবধি সম্প্রসারণ করা হয়। তারও প্রায় আট বছর পর ১৮৯৯ তে কালকা-শিমলা রেলের চূড়ান্ত নকশা পেশ করা হয় এবং কাজ আরম্ভ হয়। শুরুর সময় থেকেই এই রেলপথ কিন্তু স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে চলেছে। এই রেলের ভাড়া দেশের অন্যান্য রেলের থেকে কিন্তু বরাবরই বেশি ছিল। তার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় যে এই রেলপথটি সুরক্ষিত রাখতে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের যে দৈনন্দিন খরচ তা সমতলের থেকে সবসময়ই বেশি। এছাড়াও প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও রেলকর্মীদেরকে যেভাবে

কাজ করতে হতো তার জন্যও আলাদা খরচ বরাদ্দ ছিল। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে এই রেল পথটিকে ২'৬" ন্যারোগেজে রূপান্তরিত করা হয় দেশের বাকি ন্যারোগেজ রেলের সঙ্গে সাম্যতা আনার জন্য। এই প্রক্রিয়ার আসল কারণ ছিল তৎকালীন ভারতীয় সেনার তরফ থেকে আসা একটি অনুরোধ। এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকাতে রেলপথের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন সরঞ্জাম সহজে পৌছনো যাবে। ১৯০৬ সালে দেউলিয়া হওয়ার থেকে বাঁচাতে ব্রিটিশ সরকার কালকা-শিমলা রেলকে অধিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শুনলে আশ্চর্য হবেন অনেকেই, যে এই রেল এক কালে পরিচালিত হতো লাহোরে অবস্থিত দিল্লী-আম্বালা-কালকা লাইনের সদর দফতর থেকে। পরে সরকারি অধিগ্রহণের পর সদর দফতর স্থানান্তরিত হয় শিমলাতে যা তখন দেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিলো। স্বাধীনতার পর যখন রেলবোর্ড পাকাপোক্ত ভাবে দিল্লীতে স্থায়ী হয় তখন আম্বালাতে আঞ্চলিক সদর দফতর গঠন করা হয়। বর্তমানে সেখান থেকেই এই রেল পরিচালিত হয়।

কালকা স্টেশনে দাঁড়িয়ে টয়ট্রেন — ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

গৃহিণীর কনুই এর খোঁচায় ফিরে এলাম বর্তমানে। বারোটা প্রায় বাজে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলো। একটা অদ্ভুত সুন্দর ব্যাপার দেখা যায় যে দিল্লী থেকে যে লৌহ শকটের পেটের ভেতরে এলাম সেটির নাম ছিল হিমালয়ান কুইন, আবার যেটিতে করে শৈল শহরে পাড়ি দেবো সেটির নামও হিমালয়ান কুইন। পেটের কথায় মনে পড়লো যে সামনে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার যাত্রা কিন্তু এই ট্রেনটিতে মধ্যাহ্নভোজের কোন ব্যবস্থা নেই এবং সেটির জোগাড়ের ব্যবস্থাপনা যে এই গোবেচারা প্রাণীটির ওপরেই বর্তাবে সেটাতেও সমগ্র স্বামীকুলের কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। ডিজেল শেডটার দিকে একবার চুঁ মারার মতলবটা পুরো মাঠে মারা গেলো। উদরদেশের শান্তির যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে সংরক্ষিত ছোট্ট কামরার মধ্যে নিজেদেরকে যথাসময় চালান করার কিছু পরেই ট্রেন ছাড়লো। সংরক্ষিত কামরার যাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। কিছু যাত্রী আবার স্থানীয়। কিছু বিদেশি পর্যটকদের দেখাও পাওয়া গেল। মিষ্টি কুহুধ্বনিতে কালকা স্টেশনকে বিদায় জানিয়ে, ৬খানা ক্ষুদে ক্ষুদে কামরা নিয়ে, তার পাহাড়ে ওঠার যাত্রা শুরু করলো ডিজেল ইঞ্জিন চালিত কালকা-শিমলা টয়ট্রেন। কামরাগুলি ছোট্টর ওপর বেশ আরামদায়ক। দুপ্রান্তে একটি করে বাথরুমও আছে। ১৯০৩ সালে শুরুর সময় ছিল আরো ছোট্ট ছোট্ট আগাগোড়া কাঠের তৈরি কামরা। তার মধ্যে কিছু দিল্লির জাতীয় রেল সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এরপর ১৯১০ থেকে এলো নিচে স্টীলের বগিওয়ালা একটু বড় কামরা। এবং পরবর্তী কালে নিত্যনতুন প্রযুক্তির সাহায্যে আরো ভালো, হালকা অথচ মজবুত আর আরামদায়ক কামরা তৈরি হতে থাকে। বিলাসবহুল saloon car তো আছেই, ইদানিং বাতানুকুল কামরাও আমদানি হয়েছে। যাত্রার শুরুতেই বাঁদিকে পড়ে ডিজেল শেড যেখানে এই রেলপথের প্রতিটি লোকোমোটিভকে দেখভাল করা হয়। আমাদের ট্রেনটি আবার এক্সপ্রেস শ্রেণীর। সমগ্র যাত্রাপথের ১৮টি 'ইস্টিশনের' মধ্যে ৮টি তে ইনি নাকি দাঁড়াবেন না। আগে এই রেল চলতো চার চাকার (০-৪-০) বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে। তারপর ১৯০২ তে এলো ছয় চাকার (২-২-২) ইঞ্জিন। অবশ্য ওই সবগুলোই নির্মাণসামগ্রী নিয়ে যাবার কাজ করতো। তারপর ১৯০৩ আসে ইংল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের Sharp & Stewart কোম্পানির তৈরী ১০ চাকার (২-৬-২) ইঞ্জিন যা যাত্রীবহন করার কাজে লাগানো হয়। কালের নিয়মে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনগুলির পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিন এর আনাগোনা শুরু হয় ১৯৫২ থেকে। এবং ১৯৮০র মধ্যে সমস্ত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ওই যে কথায় আছে, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে - ঠিক তেমন বাষ্পচালিত মুগ 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। আন্তর্জাতিক রেলপ্রেমী পর্যটকদের প্রবল চাপের মুখে পড়ে, ১৯০৫ সালের তৈরি একটি ইঞ্জিন কে আবার কর্মক্ষম করে তাকে আবার যাত্রীবহনযোগ্য করে তোলা হয় ২০০১ সালে।

পুনরুজ্জীবিত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন KC - 520 — ছবিঃ সোমতন্ত্র দাস

এই বাষ্পচালিত ট্রেনটিকে হেরিটেজ আখ্যা দিয়ে বেশি ভাড়া ধার্য করা হয় এবং সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে। প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন গুলো ছিল জার্মান কোম্পানি Jung এর তৈরি যেগুলোকে প্রথমে ZDM-1 ও পরবর্তী কালে মাথেরান রেলের NDM-1 শ্রেনীভুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৬০ সালে আসে ZDM-2 শ্রেণীর ইঞ্জিন। এগুলো জার্মান MaK কোম্পানির তৈরি করা। এবং তারপর ১৯৭০ থেকে আমাদের চিরপরিচিত চিত্তরঞ্জন কারখানার তৈরি ZDM-3 শ্রেণীর ডিজেল-হাইড্রলিক ইঞ্জিনের অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়। বর্তমানে প্যারেল কারখানায় ২০০৯ সালের তৈরী কিছু ইঞ্জিনও এই রেলপথে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘোর কেটে গেল। কালকা ছাড়ানোর পর থেকেই প্রকৃতি যেন তার চিরসবুজের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে। ভরা বর্ষার মরসুম চলছে, ধুলো-দূষণহীন শ্যামলতার পরশে গুরুগম্ভীর হিমালয়ের পাদদেশে এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছে, যা

গুম্মান স্টেশন ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

কোটি স্টেশন ও তার পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম সুড়ঙ্গ-মুখ ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

যেকোনো শহুরে আগন্তুকদের কাছে এক অপূর্ব অনুভূতি। প্রথম স্টেশনটির নাম ট্যাঁকশাল। এই শব্দটির সাথে বাঙালিরা বেশ ভালোরকম পরিচিত। শোনা যায় সত্যিই নাকি রাজা-রাজরাদের সময় এই স্থানে কয়েন তৈরি হতো, তাই জায়গার নামকরণ যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। এই স্টেশনে না থেমে মৃদুমন্দ গতিতে ট্রেন এগিয়ে চলল শিবালিক পর্বতের পাকদণ্ডী বেয়ে তার গন্তব্যের পথে। ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রী গল্পে মশগুল। বাইরের দৃশ্যের প্রতি অনুরাগী কিছু যাত্রীও চোখে পড়ে, ক্যামেরা হাতে বিভিন্ন কামরার দরজায়। পাহাড়ের গা কেটে, সবুজ বনানীর বুক চিরে তৈরি রেলপথ ধরে এগিয়ে চলেছে হিমালয়ান কুইন। জানা গেল যে এই পথে নাকি সর্বাধিক ৪০ কিমি গতিতে ট্রেন চলাচল করে। যাত্রাপথের ১১ কিমির মাথায় পড়ল গুম্মান স্টেশন। নির্বান্ধব নির্জন ছোট্ট স্টেশনে, একাকী দাঁড়িয়ে স্টেশনমাস্টার সাহেবের দিনের শেষ আপ ট্রেনটিকে সবুজ পতাকা হাতে 'পাস' করানোর দৃশ্যটি, বেশ লাগে দেখতে। দৃশ্যটি চোখের আড়াল হতে দেরি লাগলো না। চারপাশে দেবদারু পাইনের সমাহার এবং তার সাথে লাইনের পাশে বানরকুলের সারি বেশ চিত্তাকর্ষন করে। ইতিমধ্যেই ট্রেন ৯টি সুড়ঙ্গ পার করে ফেলেছে। এই অনন্যসুন্দর রেলপথটিতে এক সময় ১০৭টি সুড়ঙ্গ ছিল। ১৯৩০ সালে এর মধ্যে ৪টিকে বাতিল ঘোষণা করা হয় কিন্তু এবার আর নম্বরের কোনো পরিবর্তন করা হয় না, তাই শেষ সুড়ঙ্গটি এখনো ১০৩ নামেই পরিচিত। তাই বর্তমানে এই ছোট রেল মোট ১০২টি সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে তার গন্তব্যে পৌছোয়। এর স্থপতিশৈলীর নৈপুণ্যের জন্য একে বৃটিশ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল রেলওয়ের 'মাথার মুকুট' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সমগ্র রেলপথটিতে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৯৪৪টি সেতু আছে যার মধ্যে কিছু আগাগোড়া পাথরের খিলান দেওয়া, রোমান স্থাপত্যনুসারে তৈরি করা। যার প্রায় ২০০টি অতিক্রম করে ইতিমধ্যে ট্রেন পৌছেছে কোটি নামের একটি স্টেশন যার পরেই আছে এই রেলপথের দ্বিতীয় বৃহত্তম ১০ নম্বর সুড়ঙ্গ যার দৈর্ঘ্য ৭০০ মিটার। কু ঝিক ঝিক পাহাড়ি ট্রেন এর জানলায় বসলে পাহাড়ের ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া আর চারপাশের অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য মনকে যেন এক অন্য জগৎএ নিয়ে যায়। ২৬ কিমির মাথায় আর ৪৩৭৭ ফুট উচ্চতায় পড়লো সোনওয়ারা। বেশ কিছু নামী ও বড় বড় রিসোর্ট এর সৌজন্যে এই সোনওয়ারা এখন একটি প্রখ্যাত একটি উইকেন্ড ডেস্টিনেশন। আর তাছাড়াও শিবালিক পর্বতমালার অপরূপ সৌন্দর্যের সম্ভার তো আছেই। তারসঙ্গে এখানে একটি নামকরা প্রাইভেট বোর্ডিং স্কুলও আছে। কিন্তু এখানেও না থেমে, আরো কিছুদূর এগিয়ে, টানা ৩২ কিমি পথ অতিক্রান্ত করে ট্রেন তার প্রথম বিরতি দিলো ধরমপুর

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

সোনওয়ারা স্টেশন ছবিঃ সোমদত্ত দাস

প্যারেল কারখানায় তৈরী ডিজেল ইঞ্জিন

ছবি: সোমব্রত দাস

পথে হলো দেখা...

ছবি: সোমব্রত দাস

পাথরের খিলান দেওয়া সেতু (viaduct) ছবিঃ সোমভদ্র দাস

বারোগ সুড়ঙ্গ ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

হিমাচলে। কিন্তু তার আগে ট্রেন পার করে এসেছে এই রেলপথের দীর্ঘতম সেতু তথা viaduct (২২৬ নম্বর) যা দৈর্ঘ্যে ৩১৯ ফুট এবং উচ্চতায় ৬৩ ফুট। সে কিন্তু এক অপরূপ দৃশ্য। নিচে সুগভীর খাদ, চারিধারে আদিম বৃহৎ চিরসবুজের সমাহার, তার মাঝে সুদৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীপ্রাচীন এক পাঁচতলা স্থাপত্য এবং তার ওপর দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতির দূত হিসেবে অহরহ ছুটে চলেছে এই ক্ষুদে টয়ট্রেন। ধরমপুর হিমাচল স্টেশনটি বেশ সুন্দর ও ছিমছাম। এটি এই লাইনের একটি প্রধান স্টেশন কারণ এখান থেকে একটা পথ চলে গেছে ১৩ কিমি দূরত্বে অবস্থিত কাসৌলীর দিকে। ট্রেন এখানে কিছুক্ষন থামবে কারণ কালকাগামী ট্রেনের সঙ্গে এখানে ক্রসিং আছে। এদিকে পেটের মধ্যে অগ্নিদেব ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠছেন এবং একই সঙ্গে গৃহিণী অগ্নিরূপ ধারন করার আগেই প্যাকেট করা lunch এর সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিসম্মত মনে হলো। এদিকে ডাউন ট্রেন এর সাথে টোকেন বিনিময় করার পর ট্রেন ফের তার গন্তব্যের পথে যাত্রা শুরু করলো। ইতিমধ্যে লাইনের উচ্চতা বেড়ে হয়েছে ৪৯০০ ফুট। চারপাশের দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা সত্যিই দুষ্কর। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে দেবদারু, শাল, পিয়ালের বন চিরে, ঝর্ণা পেরিয়ে, ছোট-বড় সুড়ঙ্গের মাঝে দুপুর রোদের সাথে লুকোচুরির খেলতে খেলতে মেঘ পিওনের দেশের দিকে এগিয়ে চলল স্বপ্নের খেলনা রেলগাড়ি। এরপর এলো ৫১৪০ ফুট উচ্চতায় একটি মিলিটারি ক্যান্ট স্টেশন নাম কুমারহাটি দাগসাই। মাত্র এক মিনিটের দম ফেলা আর তারপরেই আবার এগিয়ে চলা। ট্রেন এগিয়ে চললো ৩৩ নম্বর সুড়ঙ্গের দিকে যেটি এই রেলপথের সব চেয়ে দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ এবং এর নাম তার নির্মাতার নামেই দেওয়া হয় - বারোগ।

শাল পিয়ালের বনের ফাঁকে... ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

এই সুড়ঙ্গের সাথে একদিকে যেমন জড়িয়ে আছে বহু ইতিহাস তেমনি বহু লোককথা ও অতিপ্রাকৃতিক কাহিনীও। ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল বারোগ সাহেব দুই প্রান্ত থেকে এই সুড়ঙ্গ খোড়াখুড়ির কাজ শুরু করান। কিন্তু জানা যায় যে পাহাড়ের মাঝখানে যেখানে এসে দুই সুড়ঙ্গ মেলার কথা ছিল সেখানে তা মিললো না। এই বিশাল ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ডের এইরূপ ব্যর্থতা খুব হতাশ করেছিল সকলকেই। এর ফল স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার কর্নেল বারোগকে বরখাস্ত করে ও এক টাকা জরিমানাও ধার্য করা হয়। শ্রমিকদের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। এরপর এক মলিন বিকেলে, অবসাদগ্রস্ত বারোগ সাহেব তাঁর পোষ্য কুকুরকে সঙ্গে করে সেই অসমাপ্ত সুড়ঙ্গে ঢোকেন আর আত্মহননের জন্য নিজেকে গুলি করেন। প্রভুভক্ত কুকুরটি যতক্ষনে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনে ততক্ষনে তার মালিক অন্য জগৎ এর পথে যাত্রা করেছেন। সেই থেকে ওই সুড়ঙ্গ অভিশপ্ত। ওখানে নাকি এখনো বারোগ সাহেব ঘুরে বেড়ান ও আগন্তুকদের সাথে আড্ডা জমান। তবে তাঁকে আজ অবধি কারুর ক্ষতি করতে শোনা যায় নি। ১৯০০ সালে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারিংটন সাহেবের নেতৃত্বে ফের এই সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হয়। পুরনো অসমাপ্ত সুড়ঙ্গের এক কিলোমিটার দূরে এই কাজ চালু হয় কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে এবারেও ওই একই বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বাবা ভালকু নামে এক রহস্যময় সাধু এক্ষেত্রে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এবং এও বলা যায় যে বাবা ভালকুর জন্যই এই বর্তমান সুড়ঙ্গটি শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এটি এখন সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সোজাসুজি কাটা রেল যোগাযোগ সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গ পেরিয়ে পাহাড়ের অপর প্রান্তে পৌঁছতেই এসে গেল বারোগ স্টেশন, এখানে লাইনের উচ্চতা সামান্য কমে ৫০২৩ ফুট। এখানে ছোট্ট ট্রেনটির হাঁফ নেবার পালা। ৪২ কিমি পথ পেরিয়ে এসে ১০ মিনিটের বিরতি। যাত্রীরা এখানে নানা রকম টুকিটাকি খাবার, আড্ডা, চা-কফিতে মশগুল। ক্যামেরার

বারোগ স্টেশন ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

খচখচানিতে 'মুখরিত' চারিধার। ব্রিটিশ ধাঁচের প্রায় ১০০ বছরেরও পুরনো বাংলো আকারের স্টেশনটি বেশ সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়। চারপাশের পরিবেশ নিস্তব্ধ গম্ভীর। এখানে পাইন গাছের আধিক্য বেশি। সাথে নাম না জানা বেশ কিছু পাহাড়ি অর্কিড স্টেশনের শোভাবর্ধন করছে। কিছু ভালো দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার উদ্দেশ্যে স্টেশনের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনে দিগন্তবিস্তৃত অপরূপ শোভা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ১২০০০ ফুট উচ্চতার 'চুড়ধার বা চুড় চান্দি পাহাড়'। চুড় শব্দের সাথে ভারতীয় মহিলারা অতি পরিচিত। এর থেকেই এই নাম যার অর্থ হলো 'রুপোলি চুড়ির পাহাড়। জীবনসঙ্গিনীর সাথে কিছু ভবিষ্যতের নস্টালজিয়া ক্যামেরাবন্দি করে ট্রেনের দিকে ফিরলাম। মন ভালো করে দেওয়া হুইসেল বাজিয়ে টয়ট্রেন তার যাত্রা অব্যহত রাখার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যাত্রীদের সবাইকে আবার পেটের ভেতর নিয়ে ফের শুরু হলো পথ চলা। গার্ডসাহেব ও চালকের ব্যবহার বেশ আশাব্যঞ্জক। বয়স্ক ও ছোটোরা সহ প্রতিটি যাত্রী নিরাপদে ওঠার আগে পর্যন্ত কিন্তু তাঁরা ট্রেন নড়াননি।

পাইন বনের নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে, পাহাড়ি নালা টপকে, গভীর খাদকে উপেক্ষা করে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললো পাহাড়ি রেল। আঁকাবাঁকা পথের কথায় মনে পড়লো যে এই পুরো ৯৭ কিমি লাইনে, মোট ৯১৭ খানা বাঁক তথা curve আছে। এবং আশ্চর্য হলো এই, যে পুরো লাইনের ৭০ শতাংশই আঁকাবাঁকা। লাইনের অভিমুখ এখনো নিম্নগামী। পরবর্তি গন্তব্যের নাম সোলান। উচ্চতা এখানে কমে ৪৬৮৮ ফুট। এই জায়গাটিকে মিনি শিমলাও বলা হয়ে থাকে। এখানে জাগ্রত শুলিনীদেবী মন্দির আছে, তার থেকেই জায়গার এই নামকরণ। ফি বছর জুন মাসে দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে ৩-দিন ব্যাপী মেলা বসে ও বিরাট জনসমাগম হয়। এছাড়াও সোলানকে মাশরুম সিটি ও বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া সোলান তার বিখ্যাত বুয়েরীর জন্যও পরিচিত।

সোলানকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম শিমলার অভিমুখে। যাত্রা পথে বন জঙ্গলে আবৃত একটি ছোট্ট হল্ট স্টেশন সোলান বুয়েরি পার করলো হিমালয়ান কুইন। জনমানব হীন একটি পরিত্যক্তপ্রায় স্টেশন কে দেখে বেশ অবাক হলাম এবং স্টেশনটি ব্যবহার যোগ্য তথা কোনো প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ানোর চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হলোনা। কখনো বনের মধ্যে, কখনো সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে কখনো বা পাহাড়ের ধার ঘেঁষে, এগিয়ে চলেছি আমরা। এর মাঝে সুয্যিদেবকে ফাঁকি দিয়ে কখন যেন এক পশলা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেলো চারপাশ। মেঘেরা দল ভারী করে এযাত্রায় বেশ কিছুটা পথ আমাদের সঙ্গ নিল। এসবের মাঝে ট্রেন এসে দাঁড়ালো সালোগ্রা স্টেশনে। উচ্চতা এখানে কিছুটা বেড়ে ৪৯৫১ ফুট। ট্রেন অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করে ফেলেছে। ঘড়ির কাঁটাও এদিকে দুপুর ৩টে ছাড়িয়েছে। স্টেশনটি এক কথায় অপূর্ব। পাহাড়ি রেল স্টেশন বললেই যে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা করা, নির্জন সবুজ মাখানো একটুকরো খোলা প্রান্তর, ছোট্ট একটা স্টেশনঘর, তার সামনে দাঁড়ানো ছোট্ট খেলনা ট্রেন মনে পড়ে, হুবহু সেরকম কিছু যেন চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায় এবং এই সবকিছু গত ১০০ বছরেও যেন একই আছে। সময় যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়ে। সাথে কি এই রেলকে ইউনেস্কো বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রেলের তালিকাভুক্ত করেছে। দুঃখ শুধু একটাই যে ট্রেন এখানে মোটে এক মিনিটের জন্য থামে। তাই লালমোহনবাবুর ভাষায় 'ভালো করে কালটিভেট করা গেলো না'। বিশেষ করে স্টেশনের ঠিক পেছনেই

পাকদন্ডির পথ বেয়ে... ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

সালোগ্রা স্টেশন ছবিঃ সোমত্তর দাস

একটি লোভনীয় টিলা আছে যেটায় চেষ্টা করলে এক ছুটে উঠে পড়া যায়। কিন্তু তার জন্য সময় দিতে ট্রেন রাজি ছিলো না। সে ফের তার মৃদুমন্দ ছন্দে এগিয়ে চলে। বিভিন্ন নাম না জানা সবুজের ভিড়, কত পাহাড়ি কাঁটা ঝোপ, বুনো ফুলের গাছ আরো কতকিছু সব পেছনপানে দেয় পাড়ি। বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ের মন মাতানো গন্ধ যেন যোগ্য সঙ্গ দেয়।

আমার ভ্রমনসঙ্গিনীকে আগেই এই রেলপথ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো ছিল এবং কৈতব্যবাদের কি অপার মহিমা, এই সমগ্র যাত্রাপথে তাঁকে উপেক্ষা করে, হাঁ করে বাইরের দৃশ্য গেলা সত্ত্বেও, তাঁর তরফে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। বরং তিনিও এই যাত্রা বেশ উপভোগ করছিলেন। এসবের ফাঁকে ট্রেন ৫৯ কিমি পথ পেরিয়ে পৌঁছলো কান্দাঘাট স্টেশনে। উচ্চতা কমে এখন ৪৭০১ ফুট। এটি একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। পাটিয়ালার রাজা ভূপিন্দর সিং এখানে তাঁর প্রাসাদ তৈরি করেন। নেপালের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশ সরকার তাকে এখানে জমি প্রদান করে। এখান থেকে এই পথের মূলপর্বের চড়াই শুরু। কান্দাঘাট ছাড়িয়ে কিছুটা এগোলে আবার একটি পাথরের খিলান দিয়ে রোমান স্থাপত্যনুসারে তৈরি তেতলা সেতুর (৪৯৩ নম্বর) ওপর দিয়ে ট্রেন এগিয়ে চললো, এর দৈর্ঘ্য ১০৫ ফুট। কুয়াশা চাদর ফুঁদে ট্রেনটিকে ঢেকে ফেলার বৃথা চেষ্টা শুরু করেছে। সামনের পথ মেঘের কোলে হারিয়ে যাবার তোড়জোড় করছে। এর মাঝে ৬৩ কিমির মাথায় কানোহ স্টেশন পার হয়ে গেল। উচ্চতা এবার বেড়ে ৫৪০৪ ফুট। এখানে কালকাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সাথে দেখা হলো, আমাদের ট্রেন না থেমে এগিয়ে চললো। এবং এর পরপরই এলো এই লাইনের সবথেকে বৃহত্তম, ৭৫ ফুট উচ্চতার, পাঁচতলা পাথরের খিলান দেওয়া, ৫৪১ নম্বর সেতু, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০ ফুট। ঘড়ির কাঁটা বলছে ৪টে। বেশ শীত শীত অনুভব হচ্ছে। জানালার বাইরে

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

আসপাশের স্থানীয়দের পোশাক দেখেও বোঝা যায় যে শীতের দেশে এসে পরেছি। ৭২ কিমির মাথায় ও ৫৫৮১ ফুট উচ্চতায় কথলিঘাট স্টেশনেও ট্রেন থামলো না এবং এখানেও ফের একটি ক্রসিং পড়লো। কালকা অভিমুখী হিম দর্শন এক্সপ্রেস আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। এই স্টেশনের বিশেষত্ব হলো এর অবস্থান। খাদের কিনারে স্টেশন, খাদের ওপর প্রান্তে মেঘ-কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ পাহাড়ের সারি,

কথলিঘাট স্টেশন — ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

দূরে চিরতুষারের রাজ্য, অনেক নিচে ফুঁদে ফুঁদে কিছু ঘর বাড়ি। পাহাড়ের গা কেটে থাক থাক করে তৈরি করা ধানক্ষেত আর চারপাশে ফার, পাইন আর রডডেনড্রনের সমাহার, অজানা পাখির ডাক সব মিলিয়ে বলতে গেলে টেনিদার ভাষায় একেবারে 'ডি লা গ্র্যান্ডি' পরিবেশ।

সৃষ্টিকর্তার অপার সৃষ্টির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, প্রকৃতির নৈসর্গিক শোভায় বিভোর হয়ে, কুউ ঝিক ঝিক মৃদু ছন্দে বুঁদ হয়ে, প্রায় চার ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে কখন যে যাত্রাপথের অন্তিম ভাগ এসে পরেছে খেয়াল ছিল না। সম্বিত ফিরল যখন ট্রেন শোগি স্টেশনে প্রবেশ করছে। যাত্রাপথের ৭৭ কিমির কাছাকাছি এই স্টেশন। শিমলা এখান থেকে মেরেকেটে ১৮ কিমি। এখান থেকে শিমলা জেলারও শুরু। ৬০০০ ফুট উচ্চতায়, শোগি জায়গাটি বেশ ছিমছাম। শিমলার ভিড়ভাট্টা থেকে দূরে, বেশ সাজানো গোছানো একটা ছোট্ট মফস্বল। হিমাচল সরকার এখানে বেশ কিছু বাংলো প্যাটার্নের কলোনী বানিয়েছে যেগুলো প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে বেশ সুন্দর লাগে দেখতে। তাছাড়া এখান কার প্রধান আকর্ষণ হলো বেশ কিছু প্রাচীন মন্দির যা টেনে আনে বহু পর্যটককে। ট্রেন কিন্তু এখানেও না থেমে আরো কিছুটা এগিয়ে

শোগি স্টেশন — ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

চললো। এবং একেবারে ৮৪ কিমি পথ পেরিয়ে ৬৩৫২ ফুট উচ্চতার তারাদেবী স্টেশনে এসে থামলো। এখানেই তারা মায়ের আর সংকটমোচন দেবীর মন্দির আছে। এটিকে শিমলার উপকণ্ঠ বলা চলে। এটিও একটি প্রসিদ্ধ দেবস্থান ও জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। পাহাড় আর গাছপালায় ঘেরা মন্দিরটির পরিবেশ অনন্যসাধারন - মনের শান্তির জন্যে সত্যিই এক আদর্শ উপাসনাস্থল। এখানে একটি মিষ্টি সারমেয়র সঙ্গে আলাপ হল। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গায়ে লোমের আধিক্য বেশি। সে কিছু খাবার প্রত্যাশা করে এসেছিল তাকে তা দেবার পর দাঁড়িয়ে লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। ট্রেন এখানে অল্প সময়ে থেমে ফের এগোলো তার গন্তব্যের পথে। স্টেশন ছাড়াতেই ট্রেন ঢুকে পড়ল এই পথের তৃতীয় দীর্ঘতম সুড়ঙ্গে (৯১ নম্বর), যা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ কিমি। ঘড়ি বলছে সময় প্রায় পাঁচের কাছাকাছি। মেঘ-কুয়াশার যুগলবন্দীতে রোদের তেজ উধাও। ঠান্ডাটা এবার বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে বেশ বড় একটা জনপদ দেখা যাচ্ছে। ওটাই হলো ইনভারাম হিল। ওর অপর প্রান্তেই হিমাচলের রাজধানী - শিমলা। কিন্তু তার আগে ৯০ কিমির কাছাকাছি প্রসপেক্ট হিলের গায়ে পড়লো জুটোঘ বলে এক ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন। এখানে উচ্চতা ৬৪২৪ ফুট। ১৮৪৩ সালে বৃটিশ সরকার প্রথম এখানে একটি সেনা ছাউনি তৈরি করে। পথ প্রায় ফুরিয়ে এলো, নটে গাছটিরও এবার মুড়িয়ে যাবার পালা। জুটোঘ ছাড়িয়ে ট্রেন ইনভেরাম হিলের গা ঘেঁষে এগিয়ে চললো পরবর্তী স্টেশন সামারহিলের দিকে। এর দূরত্ব কালকা থেকে ৯৪ কিমি। উচ্চতা ৬৬৯৯ ফুট। এটি বলতে গেলে শিমলা

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

শহরেরই আরেকটা স্টেশন। এর পাশে পুরোপুরি একটা কর্মব্যস্ত শহরের কোলাহল কানে আসে। শুধু এটা অবস্থিত পাহাড়ের এইদিকের ঢালে। এখান থেকে পরবর্তী ও প্রান্তিক গন্তব্যের দূরত্ব তিন কিমিরও কম। শুধু এর মাঝে শেষ একটা সুড়ঙ্গ (১০৩ নম্বর) পার করার দেরি। সামারহিলেই ট্রেন প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে গেল। স্থানীয় বাসিন্দারা যারা ট্রেনে সহযাত্রী ছিলেন মূলত তারাই এখানে সঙ্গ ত্যাগ করলেন। এরপর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বিরাট একটা বাঁক নিয়ে অবশেষে টয়ট্রেন পৌছল তার গন্তব্যে। যাত্রার এখানেই ইতি। ৯৬ কিমি পথ উজিয়ে, ১০২টি সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে, ৯০০রও বেশি সেতু পার করে, নির্ধারিত সময়ের ২০ মিনিট আগেই, কালকা-শিমলা টয়ট্রেন তার যাত্রীদের নিয়ে এলো ৬৮০৮ উচ্চতায় হিমালয়ের 'রানী' - শিমলাতে। এখানে দেখা হলো কালকাগামী রেলমোটরের সাথে। এটি এই রেলপথের আরেকটি বিশেষত্ব। ১৯১১ সালে প্রথমবারের জন্য লন্ডনের Drewery কোম্পানির তৈরি পেট্রলচালিত রেলমোটর কারের ব্যবহার শুরু হয়। এগুলি মূলত ডাক নিয়ে যাওয়া আসা করার কাজে লাগানো হয়েছিল। ১৯৩২ সাল থেকে নতুন ধরনের ডিজেল-ইলেকট্রিক চালিত রেলমোটর কার গুলির ব্যবহার শুরু হয়। এগুলো কিন্তু মূলত যাত্রী পরিবহনের কাজেই ব্যবহার হতে শুরু হলো। বড় বড় জানলা, আরামদায়ক গদিআটা আসনযুক্ত এই গাড়িগুলি পর্যটকদের মধ্যে প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়। কালকা শিমলা রেল কিন্তু এই ব্যাপারে চিরকালই পথিকৃৎ। এর পরিচালন কর্তারা বরাবর চেষ্টা করে গেছেন যে স্বতন্ত্রতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং ঐতিহ্য ও নতুনত্বের মেলবন্ধন ঘটিয়ে কি ভাবে এই রেলপথের উন্নতিসাধন ও জনপ্রিয়তা বজায় রাখা যায়। এই একই কারণে, শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ২০০৮ সালে এই রেলপথকে ইউনেস্কোর World Heritage লিস্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সারা বিশ্বে খুবই নগণ্য সংখ্যক পাহাড়ি রেল আছে যারা আজও ঐতিহ্য ধরে রাখতে পেরেছে। ভাবতে গর্ব হয় যে ভারতের প্রতিটি পাহাড়ি রেলই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। যাইহোক, গল্পে গল্পে হলো বেলা। কবির ভাষায় বললে 'বেলা যে পড়ে এলো, এবার জলকে চল।' সত্যিই সত্যিই সুম্যিমামা নিদ্রা গেছেন বেশ কিছুক্ষণ। দিনের আলোও প্রায় ফুরুৎ হবার মুখে। চারপাশে কুয়াশার ঘনঘটা। গোধূলিবেলার শিমলাস্টেশন যাত্রী সমাগমে সরগরম। কালকা অভিমুখি রেল মোটর ও শিবালিক ডিলাক্স অপেক্ষা করছে ছুটি শেষের যাত্রীদের ঘরে ফেরাতে। সঙ্গিনিকে সাথে নিয়ে, লটবহর বগলদাবা করে প্ল্যাটফর্মে নেমে এসে, গত সাড়ে পাঁচঘণ্টার সফরসঙ্গী কালকা-শিমলা পাহাড়ি রেলকে বিদায় জানালাম। এবার কিছুদিন মেঘ পিওনের দেশে ছুটি কাটানোর পালা।

কালকা - শিমলা রেল মোটর ও তার পেছনে শিবালিক ডিলাক্স

ছবিঃ সোমভদ্র দাস

বেয়ার গ্যারাট

বর্তমানে অতীতের ছোঁয়া

সুমন মুখোপাধ্যায়

আকারে আয়তনে সে যেন এক দৈত্য যার পেটে কয়লা ধরে ১৫ টন আর জল ধরে ৬০ হাজার লিটার। বয়স প্রায় ১০০ ছুঁইছুঁই, কিন্তু রূপে ও পরাক্রমে এখনো সে যেন ঐ যুবকটিই রয়ে গেছে। এই বয়সেও সে প্রবল পরাক্রমে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে চলতে সক্ষম ,তবে ইদানিং বেশিরভাগ সময়টাই সে ঘুমিয়ে কাটায়।

ঘুমন্ত এই দৈত্যটি আসলে একটি স্টিম ইঞ্জিন যার পোশাকি নাম "বেয়ার গ্যারাট"। জন্ম বিলেতে। আকার আয়তনে তো বটেই, দক্ষতা ও ক্ষমতার দিক থেকে যার কাছে নিতান্তই শিশু সে যুগের অন্যান্য স্টিম ইঞ্জিনগুলি। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তৈরি প্রকাণ্ড স্টিম ইঞ্জিনগুলি এক সময় ভারত তো বটেই, তার সাথে গোটা বিশ্বের রেল দুনিয়ায় দাপিয়ে রাজত্ব করে গেছে। ব্রিটিশ লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার হারবার্ট উইলিয়াম গ্যারাট এই ধরনের ইঞ্জিন তৈরির পরিকল্পনা করেন। নিউ সাউথ ওয়েলস রেলওয়ের লন্ডনের ইনস্পেক্টিং ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। ম্যানচেস্টারের চার্লস ফ্রেডরিক বেয়ার ও রিচার্ড পিককের সংস্থা 'বেয়ার পিকক অ্যান্ড কোম্পানি'র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন মিস্টার হারবার্ট উইলিয়াম গ্যারাট। সিংহভাগ গ্যারেট ইঞ্জিনই তৈরি করেছে এই সংস্থা।

গঠন ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে বেয়ার গ্যারাট একেবারেই অনন্য। অন্যান্য সব স্টিম পৃথক কাঠামো থাকে। ইঞ্জিনের সামনে ও পিছনে দুটি পাওয়ার ইউনিট রয়েছে। মাঝে বয়লার ইউনিট ও ক্যাব। দু'দিকের পাওয়ার ইউনিটেই রয়েছে জলের ট্যাঙ্ক। গ্যারাটের প্রযুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হল, খাড়াই রেলপথ কিংবা বড় বাঁকে অনায়াস গতিতে চলতে পারত এই প্রকাণ্ড ইঞ্জিন। ঘণ্টায় প্রায় ৭০ কিলোমিটার গতিতে চড়াই উতরাই পথে ২৪০০ টন ওজনের ট্রেনকে সহজেই টানতে সক্ষম ছিল এই গ্যারাট ইঞ্জিন। পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি যাত্রীবাহী ট্রেনও টানত প্রকাণ্ড ইঞ্জিনগুলি।

১৯২৭ সাল নাগাদ তৎকালীন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (B.N.R.) ভারতে প্রথম বেয়ার গ্যারাট স্টিম ইঞ্জিন চালানো শুরু করে। ইংল্যান্ডের লিভারপুল থেকে জাহাজে চাপিয়ে ইঞ্জিনগুলি ভারতে আনা হয়েছিল । বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের হাতে বেয়ার গ্যারাটের ২ টি 'এইচ এস জি' ক্লাসের ইঞ্জিন এবং ১৬ টি 'এন' ক্লাসের ইঞ্জিন ছিল । ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই বেয়ার গ্যারাট ইঞ্জিনগুলি ভারতীয় রেলকে পরিষেবা দিয়ে এসেছে। সেই সময় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মূলত আনারা-ভোজুডিহ এবং ভিলাই-ডাল্লিরাজহারা শাখায় ব্যবহার করা হতো এই প্রকাণ্ড ইঞ্জিনগুলি । প্রধানত কয়লা পরিবহনের কাজে ব্যাপকভাবে বেয়ার গ্যারাট ইঞ্জিনকে ব্যবহার করেছে দক্ষিণ পূর্ব রেল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকীকরণের ছাপ পড়েছে ভারতীয় রেলে । স্টিম যুগের পর এল ডিজেল ইঞ্জিন আর এখনতো হাই-স্পিড ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের একচ্ছত্র আধিপত্য।

ছবিঃ সোমশুভ্র দাস

ছবিঃ রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

সময়ের স্রোতেই প্রয়োজন ফুরালো অতিকায় এইসব বিলিতি ইঞ্জিনগুলির। '৭০ সালে বৈদ্যুতিকরণের সঙ্গে সঙ্গে বেয়ার গ্যারাট চালানো বন্ধ করে দেয় দক্ষিণ পূর্ব রেল। রেলের পরিভাষায় 'ডিকমিশনড' করে দেওয়া হয় ইঞ্জিনগুলি ও তারপর সেগুলি স্ক্র্যাপ করে দেওয়া হয়। তবে তারই মধ্যে দুটি 'এন' ক্লাসের বেয়ার গ্যারাট সংরক্ষিত আছে - ৩৮৮১১ এবং ৩৮৮১৫। এদের মধ্যে ৩৮৮১৫ ইঞ্জিনটি দিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে এবং ৩৮৮১১ ইঞ্জিনটি আছে খড়গপুর ওয়ার্কশপে।

দু'বছর আগে বেয়ার গ্যারাট স্টিম ইঞ্জিনটি সংস্কার করে ট্রায়াল রানের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ পূর্ব রেল। ২০১৮-র ২২ সেপ্টেম্বর খড়গপুর-মেদিনীপুর শাখায় ইঞ্জিনটি চলেছিল । ম্যানচেস্টারের বেয়ার পিকক অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি ৯০ বছরেরও বেশি পুরনো দৈত্যাকার ইঞ্জিনকে সচল করে তোলা মুখের কথা ছিল না। খড়গপুর ওয়ার্কশপের কর্মীরাই এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। যার মূল কারিগর ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রেল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এম এস রঙ্গস্বামী। জরাগ্রস্ত নবতিপর ইঞ্জিনকে সচল করে তুলতে দিনরাত এক করে পরিশ্রম করেছেন চেন্নাইয়ের বাসিন্দা অশীতিপর এই ইঞ্জিনিয়ার। এখনো পর্যন্ত দেশে যে ক'টি স্টিম ইঞ্জিনকে সংস্কার করা হয়েছে তার প্রায় সবকটিই করেছেন রঙ্গস্বামী। ২০০৬-য়ের নভেম্বরে একবার এই ইঞ্জিন দিয়ে শালিমার থেকে মেচেদা পর্যন্ত হেরিটেজ রান করেছিল দক্ষিণ পূর্ব রেল।

ছবিঃ সোমশুভ্র দাস

ওই ট্রেনে যাত্রা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী।

শ্রী রঙ্গস্বামীর নিজের কথায়, "বেয়ার গ্যারাটকে ফের ট্র্যাকে নামানো নানা দিক থেকে বেশ ঝুঁকির ছিল। মূল সমস্যা ছিল যন্ত্রাংশ নিয়ে। ওই ইঞ্জিনটির কোনো যন্ত্রাংশ এখন আর পাওয়া যায় না। তাই খড়গপুর ওয়ার্কশপেই যন্ত্রাংশ তৈরি করে নেওয়া হয়। আর কিছু জিনিস দিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আরেকটি বেয়ার গ্যারেট থেকে আনা হয়। ইঞ্জিনটির প্রযুক্তিগত দিক সম্পর্কে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারও এখন আর নেই। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সবকিছুকে জয় করে দফায় দফায় 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতিতে এই ইঞ্জিনকে সচল করে তোলা হয়। আবার ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল প্রকাণ্ড এই দৈত্য।

২০১৮ -য়ের ২২ সেপ্টেম্বর, একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনেই বেয়ার গ্যারাট দিয়ে ট্রায়াল রানের আয়োজন করে দক্ষিণ পূর্ব রেল। ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তের সাক্ষী হতে সকাল-সকাল খড়গপুর স্টেশন পৌঁছে গিয়েছিলেন বহু রেলপ্রেমীরা। ওয়ার্কশপ থেকে শান্টিং করে হুইসেল বাজাতে-বাজাতে তিন নম্বর প্লাটফর্মে ঢুকলো বেয়ার গ্যারেট। পিছনে তিন চারটি কামরা ও একদম পিছনে একটি ডিজেল ইঞ্জিনকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল,

ছবিঃ সোমশুভ্র দাস

মূল চালিকা শক্তি। ছবিঃ সোমশুভ্র দাস।

গ্যারেটের ভেতরে এক নজর। ছবিঃ সোমশুভ্র দাস।

যাতে যেকোন সমস্যাজনক পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া যায়। যাত্রা শুরুর আগে ইঞ্জিনে সামান্য পুজো করে নারকেল ফাটানো হল। ফায়ারম্যানরা নাগাড়ে বেলচা দিয়ে কয়লা দিয়ে চলেছেন বয়লারে। উড়ছে ধোঁয়া। স্টেশনের যাত্রী, রেলকর্মী, রেলপ্রেমীদের মধ্যে তখন সেলফি ও ছবি তোলার হুড়োহুড়ি। অবশেষে এলো সেই সময়, সকাল ঠিক ১০ টা ৩০ মিনিট সবুজ পতাকা নেড়ে, হুইসেল বাজিয়ে ঢাকা গড়ালো বেয়ার গ্যারাটের , শুরু হল সেই ঐতিহ্যময় ইঞ্জিন এর পুনর্যাত্রা। তীব্র বাষ্পে চারপাশ সাদা করে ধীরে ধীরে স্টেশন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল ট্রেনটি, গন্তব্য মেদিনীপুর। উৎসাহী রেলপ্রেমীদের মুঠোফোন ও ক্যামেরার লেন্সে বন্দি হয়ে রইল এই স্মরণীয় মুহূর্ত।

ভোঁস ভোঁস করে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কু-উ-উ-ঝিক ঝিক শব্দের ছন্দে এগিয়ে চলেছে বর্ষীয়ান এই প্রকাণ্ড ইঞ্জিন। লাইনের পাশে অপার বিস্ময়ে তা উপভোগ করছে আট থেকে আশি। একদিকে যেমন প্রবীণরা খুঁজে পেয়েছেন তাদের সেই হারিয়ে যাওয়া কৈশোর কে, ঠিক তেমনই যেন নবীনরা অবাক চোখে প্রত্যক্ষ করছে ইতিহাস কে।

পুজোর আগে রেললাইনের দু'পাশে কাঁসাই নদীর চরে তখন কাশফুলের ঝাঁক, যা মনে করিয়ে দিয়েছিল পথের পাঁচালীর সেই বিখ্যাত প্রেক্ষাপটকে, অপু-দুর্গা ছুটে চলেছে আর দুইদিকে কাশফুলের বন, এরই মাঝে ছুটে চলেছে কয়লার ইঞ্জিন। সবমিলিয়ে টাইমমেশিন যেন পিছিয়ে নিয়ে গেছিল কয়েকটা দশক। একে একে পেরোলো গিরি ময়দান, গোকুলপুর, কাঁসাই নদী। উল্টোদিকে লাইনে যাচ্ছে আধুনিক যুগের এক একটি অত্যাধুনিক ট্রেন। একদিকে ঐতিহ্য, অন্যদিকে আধুনিকতা, এ যেন এক অদ্ভুত মিলনমেলা। এই দুইয়ের মেলবন্ধনই তো ভারতীয় রেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।।

প্রচ্ছদ ছবিঃ সোমশুভ্র দাসের সৌজন্যে

স্বমহিমায় বেয়ার প্যারাট!!! ছবিঃ সুমন মুখোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া - মসাগ্রাম শাখায়

নব দিগন্তের পথে...

অর্কোপল সরকার

প্রকৃতির দোলাচলে যখন বর্ষা আর শরৎ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে এবং তারই মাঝে পুজো যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, এমন দিনে একটি আচমকা ছুটির আগমন হলে নিজেকে বাড়িতে বন্দি করে রাখা বড়ই দুষ্কর। ঠিক এইরকমই এক ছুটির দিনে আমরা তিন বন্ধু বেড়িয়ে পরেছিলাম এক অজানা যাত্রার উদ্দেশ্যে, যেখানে ভ্রমণের সাথে থাকবে প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরশ।

হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটের বর্ধমান গামী কর্ড লাইন লোকালে চেপে পাড়ি দিলাম মসাগ্রামের উদ্দেশ্যে। শুরু হল কাউন্টডাউন.... একে একে ডানকুনি, বারুইপাড়া, কামারকুন্ডু, চন্দনপুর, গুড়াপ পেরিয়ে ঠিক দুপুর ১২টায় পৌঁছে গেলাম মসাগ্রাম স্টেশন। এইখান থেকেই আমাদের পরবর্তী পর্যায়ের যাত্রা শুরু হবে।

এই স্টেশনে অপেক্ষা করছিল, লালমাটির দেশ অর্থাৎ বাঁকুড়াগামী লাল-নীল রাঙা ডেমু ট্রেন। মসাগ্রাম স্টেশনে মশলা মুড়ি ও লেবু চা সহযোগে সামান্য উদরপুর্তি করে নিলাম। ঠিক ১২ টা বেজে ২০ মিনিটে হুইসেল বাজিয়ে যাত্রা শুরু করলো আমাদের ট্রেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই শাখায় আগে শুধু গভীর রাত এবং কাকডোরে ট্রেন পাওয়া যেত, কিন্তু বিগত কিছু বছর যাবত দক্ষিন পূর্ব রেলের আদ্রা মন্ডল এই শাখায় বেশ কয়েকটি ট্রেন এর ব্যবস্থা করেছে যার ফলে যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়েছে। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে গতি বাড়িয়ে বাম দিকে ঠিক অর্ধচন্দ্রাকার বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলল। ডান পাশে ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসছিল কলকাতা দিল্লি শাখার দ্রুততম রেলপথ ও বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলো। সবুজের গালিচার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম লাল মাটির উদ্দেশ্য। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ ২০১৭ সালে, মসাগ্রাম-বাঁকুড়া শাখায় বৈদ্যুতিকরণের ছোঁয়া লাগেনি।

বৈদ্যুতিকরণের চিহ্নবিহীন, সম্পূর্ণ ডিজেল চালিত শাখায়, গ্রাম বাংলার সবুজের মাঝে কাশফুল আর ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ট্রেন। ট্রেনটিতে খুব একটা ভিড় নেই। তাই খুব সহজেই জানালার পাশে মনের মতো একটি জায়গা পেয়ে গেলাম। দূষণমুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়ে, চিন্তা ভাবনাকে দূরে সরিয়ে আমার সোনার গ্রাম বাংলার রূপে মোহিত হয়ে, ট্রেনের গতির ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে আমার মন যেন গেয়ে উঠলো -- "আমি এক বার দেখি, বার বার দেখি, দেখি বাংলার মুখ"...

এরই মাঝে আমাদের ট্রেন এসে পৌছালো প্রথম স্টেশনে, নাম মোস্তফাচক। বিস্তীর্ণ সব্জি এবং ধানক্ষেতের মাঝে একটি ছোট্ট স্টেশন, তেমন যাত্রী নামাওঠা চোখে পড়ল

না। ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো এবং ধীরে ধীরে আংশিক ঊর্ধগামী হল, আর তারপরই এল সেই নদ যার উপত্যকায় আমরা আগামি ৩ ঘণ্টা বিচরণ করবো। তিনি হলেন দামোদর। এখানে দামোদর ভালই চওড়া, বর্ষার জলে যেন ক্রমশ ফুঁসছেন। আর এই কারণেই তো তার অপর নাম বাংলার দুঃখ। তবে দুই পাশে আগমনির প্রতীক, চোখ জুড়ানো সাদা কাশবন কিছুটা হলেও দামোদরের সেই রুদ্রমূর্তি ভুলিয়ে রেখেছে। নদীর অপর প্রান্তেই পরবর্তী স্টেশন হাবাসপুর, অদ্ভুত ভাবে এই শাখায় বেশ কিছু স্টেশনে কোন নাম বোর্ড নেই তাই সময় সারণী খুঁজে বার করতে হয় স্টেশন গুলির পরিচয়। এই স্টেশন ছাড়ার পরই ধীরে ধীরে মাটির রঙের পরিবর্তন শুরু হল, ধূসর কালো রঙ বদলে ধরিত্রী রাঙা হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। নদী-প্রান্তর পেরিয়ে রেলগাড়ি এগিয়ে চলেছে সম্মুখে, ছোট ছোট গ্রাম, জনপদ, মাঠ-জঙ্গল পেরিয়ে ট্রেন পৌঁছালো রায়নগর। অতীতে এই পথে যখন ন্যারোগেজ ট্রেন চলতো তখন বাঁকুড়া থেকে এই রায়নগর পর্যন্তই ট্রেন আসত। পরবর্তী কালে ব্রডগেজে রূপান্তরের পরেও বহুদিন এটিই ছিল প্রান্তিক স্টেশন। এই রেল শাখাটি কিন্তু ভারতীয় রেলের মানচিত্রে কোনো নতুন সংযোজন নয়। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৬ থেকে ৬ই জুন ১৯১৭ এর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে "McLeod's Light Railways" এর রূপে এর আত্মপ্রকাশ, যা

পরবর্তী কালে দক্ষিন-পূর্ব রেল অধিগ্রহণ করে। কু ঝিক ঝিক শব্দে ধোঁয়া উড়িয়ে স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে পরিচালিত ছোট্ট ট্রেনটি সবুজের আঙিনা বেয়ে ছুটে যেত বাঁকুড়া থেকে রায়নগর। প্রবল ক্ষতির মুখে পরে রেল দপ্তর '৯৫ সালে এই ন্যারোগেজ শাখাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এরপর ২০০৫ সালে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী ৪১ কিমি গেজ পরিবর্তন এর মাধ্যমে পুনরায় শুরু হয় যাত্রী ট্রেন চলাচল, যা ২০০৮ সালে রায়নগর অবধি বিস্তৃত হয় ও ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে মসাগ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং পূর্ব রেলের হাওড়া-বর্ধমান শাখার সাথে শুধুমাত্র স্টেশনভিত্তিক সংযুক্তিকরণ করা হয়। লাইন বা স্টেশনকে বিধ্বংসী বন্যার কবল থেকে মুক্ত রাখতে, বর্তমান রায়নগর স্টেশনটি মাটি থেকে খানিকটা উচ্চতায় তৈরি করা হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের থেকে ৬ মিনিট আগে এসে যাওয়ার দরুণ ট্রেন বেশ খানিকক্ষণ রায়নগর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকল, আর এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম। প্ল্যাটফর্মে নেমে বেশ কিছু ছবি তোলা হলো। এই স্টেশনটির একটি অদ্ভুত জিনিস হল, যে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাড়ায় সেখানে শুধু প্ল্যাটফর্ম বাদে আর কিছুই নেই, অথচ ডান দিকের প্ল্যাটফর্মটিতে রয়েছে স্টেশন বাড়ি, জলের কল সহ সবরকমের সুবিধা। একটু ভাবতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হল, যেহেতু এইটি প্রান্তিক স্টেশন ছিল সেহেতু ট্রেন থামতো বর্তমানের ঐ অব্যবহৃত প্ল্যাটফর্মে এবং ইঞ্জিন ঘোরানোর জন্য দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করা হতো। রেল লাইনটি সম্প্রসারিত হওয়ার পর প্রথম প্ল্যাটফর্মটির প্রয়োজন শেষ হয় তাই প্ল্যাটফর্ম আর লাইনটি থাকলেও তাতে ট্রেন আনাগোনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবে স্টেশনের যাত্রী সুবিধাগুলো রয়ে গিয়েছে সেই পুরোনো প্ল্যাটফর্মেই।

বেলা ১২টা ৫৫এ ট্রেন ছাড়লো রায়নগর থেকে। সত্যি বলতে এই রেল শাখার পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য ভীষণ উপভোগ্য, যাত্রা করা কালীন নয়নাভিরামের কিন্তু কোন অভাব হয় না কারণ রেলপথের দুইধারেই রয়েছে সবুজের সমারোহ। তাই সারা সপ্তাহের নানান ব্যাস্ততা, একঘেয়ে জীবন, মুঠোফোন ও বোকাবাক্সে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া চোখ দুটিকে সবুজের শীতল প্রলেপ দেওয়ার উপযুক্ত স্থান এই রেলপথে যাত্রা। সেই সবুজকে আলিঙ্গন করতে করতে, মাঝে মধ্যে সাদা কাশফুল যেন তাতে একটু আলাদা রঙের ছোঁয়া এনে দেয়। সাথে আকাশেও চলছে মেঘ রোদ্দুরের এক সুমধুর খেলা। কখনো পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আবার পরক্ষনেই গুরুগম্ভীর কালো

আকাশ আবার তার কয়েক মুহূর্ত পরেই নীল আকাশের হাতছানি। এই স্থানের বাতাসেও যেন এক অদ্ভুত বিশুদ্ধতা আছে যা এই ভাললাগার তিনটি ঘণ্টাকে লেখনিতে আনতে আরো উৎসাহ দিয়েছে। এভাবেই পৌঁছে গেলাম শ্যামসুন্দর স্টেশন। প্রধানত একটি রাইস মিলকে কেন্দ্র করে একটা ছোট্ট গ্রাম এই শ্যামসুন্দর। স্টেশনে কোন প্ল্যাটফর্ম নেই, শুধু একফালি জমি আর একটি টোটো গাড়ী আর একটি ডিজেল চালিত ভ্যান। ঠিক যেন প্রকৃতির সাথে একদম মাননসই এই স্টেশনটি। সাকুল্যে হাতেগোনা কিছু যাত্রী ট্রেন থেকে এই স্টেশনে নামলো। ট্রেন ছেড়ে দিল আবারও সেই সবুজের মধ্যে দিয়ে দুলুনি খেতে খেতে পৌঁছে গেলাম পরবর্তী স্টেশন গোপীনাথপুর। এইখান থেকে শুরু করে আগামি সবকটা স্টেশন নতুন করে তৈরির কাজ চলছে, যেমন স্টেশনঘর তৈরি, প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ ইত্যাদি।

এরপর ট্রেন পৌছল পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ব্লকে অবস্থিত সেহারাবাজার, যেটি তুলনামূলক ভাবে একটু জমজমাট জনপদ। এখানে বেশ কিছু যাত্রীর আনাগোনা দেখা যায়। স্টেশন ছাড়িয়েই ট্রেন পেরোয় সাত নম্বর রাজ্য সড়ক যা মুর্শিদাবাদের রাজগ্রামের সাথে মেদিনীপুর শহরকে যুক্ত করে। এরপরেই নজরে আসবে রেল লাইনের অদূরে দাঁড়িয়ে কারুকার্যমন্ডিত এক মসজিদ। হালকা জলযোগ, সাথে আড্ডা বেশ ভালোই জমে উঠেছে এই রেল সফর। সাথে মুঠোফোন ও ক্যামেরাবন্দী হয়ে চলেছে চারপাশের প্রকৃতি ও ভালোবাসার এই ডেমু ট্রেন।

৫০ কিমি/ঘণ্টার গতিতে চলা আমাদের ৮ কামরার ট্রেনটি পৌঁছে গেলো পরবর্তী স্টেশন কৈয়র। কৈয়র, গুহরসরঙ্গা স্টেশনগুলি প্রত্যন্ত গ্রামকেন্দ্রিক এবং এখানকার মানুষ এই ট্রেনের উপরেই নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য যে, ছোট ট্রেন বড় হয়ে ফিরে আসাতেই এদের জীবনযাপনে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আরো কিছুক্ষণের যাত্রার পর এলো একটু বড় জনপদ বোয়াইচণ্ডী, আমরা এখনো পূর্ব বর্ধমানেই বিচরণ করছি। দামোদর নদ এখন কিছুটা দূরে সরে গেছে এবং আমরা ধীরে ধীরে বাঁকুড়ার দিকে এগিয়ে চলেছি। বোয়াইচণ্ডী স্টেশনের খুব কাছেই চণ্ডী মাতার একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের স্টেশনের নামকরণে কোনো ভূমিকা আছে কিনা তা অবশ্য জানা নেই। বোয়াইচণ্ডীতে প্রচুর দক্ষিন পূর্ব রেলের কোয়ার্টার চোখে পড়লো। এই স্টেশনটিও নতুন ভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যতে এটি একটি সম্ভাব্য জংশন স্টেশন হতে পারে। এখান থেকে একটি শাখা, বর্ধমানের খানা জংশন পর্যন্ত নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

বেলা ১টা বেজে ২২ মিনিট। গাড়ী ছাড়ল বোয়াইচণ্ডী থেকে। ধানক্ষেত, কাশফুলের বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে পেরিয়ে গেলাম সাকরুল, ইন্দাস, কুমরুল, বেতুর ইত্যাদি স্টেশন। মাঝে মাঝেই আসছে ছোট ছোট খাল যারা দামোদরের জলে পুষ্ট। এইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুর বাঁধের খালটি। স্থানীয় চাষ-আবাদে এই খালগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। বেতুর স্টেশন ছেড়ে আরও মিনিট পাঁচেক যাত্রার পর এলো পাত্রসায়র। এমন সুন্দর বৃক্ষে আবৃত স্টেশনের খোঁজ পাওয়া বিরল। সাধারণত স্টেশনে ছাউনি দেওয়া হয় কিন্তু এখানে গাছেরাই যাত্রীদের ছায়া প্রদান করছে। মসাগ্রাম অভিমুখে যাওয়ার জন্য বেশ ভিড় লক্ষ্য করা গেল স্টেশনে। কিন্তু এই ট্রেনে বিশেষ যাত্রী উঠলো না। ইতিমধ্যেই আমরা পূর্ব বর্ধমান

ছেড়ে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছি। বোয়াইচণ্ডী ছাড়ার পর সেটা বুঝতে না পারলেও পাত্রসায়রে লোকজন দেখে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেলো। সরলতা মাখানো উৎসুক আদিবাসী মুখগুলো দেখতে দেখতে ট্রেন পাত্রসায়র ছেড়ে রওনা দিলো। এরপরেই এলো ধগরিয়া ষ্টেশন। জায়গাটির বিশেষ কোন গুরুত্ব না থাকলেও রেল ষ্টেশন এবং রেলপথটির চারপাশ অসাধারন, ষ্টেশনে প্রবেশ করার কিছু আগেই আমাদের ট্রেনকে

একটি ছোট্ট খাল পেরোতে হল, যার দুই পাশ দিয়ে তাল গাছের সারি আর ধান জমি যেন চোখে একটা কোমল সবুজ ছোঁয়া দিয়ে যায়। এই স্টেশনটির বিশেষত্ব হল প্ল্যাটফর্ম আর বাইরের রাস্তা দুটোই সমান উচ্চতায়। এখানের প্রধান যানবাহন এর মাধ্যম ম্যাজিক গাড়ী। একই উচ্চতা হওয়াতে গাড়িগুলো প্রায় ট্রেনের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্টেশনের বৃহৎ বট, কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার সারি প্ল্যাটফর্ম শেডের কাজ করছে। মানে এককথায় সবটাই প্রাকৃতিক। এক মিনিটের ছোট্ট বিরতিতে জনা দশেক লোকজন ওঠা নামা করলো যার বেশিরভাগই আদিবাসী গোত্রীয়। খানকতক আলোকচিত্র গ্রহন করতে করতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। ঝমাঝম সুরধ্বনির সাথে বাঁশবন, কাশবন ও খেজুরবনের মাঝ দিয়ে ছুটে, পৌঁছে গেলো ধানসিমলা। লাল মাটির দেশে, লাল মাটি দিয়ে তৈরি এই স্টেশন নিমেষেই যেন ভালো লেগে যায়। রুচিসম্মত কারুকার্য করা ছোট্ট একটি স্টেশনঘর, যেখানে স্টেশনমাস্টার তার দৈনন্দিন রুটিনে ব্যস্ত। ধানসিমলা পেছনে ফেলে ফের ট্রেন এগিয়ে চললো তার

গন্তব্যের পথে। এবং তার সাথে আবহাওয়ার মতিগতি বদলাতে শুরু হলো। দিনভর প্রখর তাপ নির্গত করে, অবশেষে সূয্যিদেব মেঘের আড়ালে একটু বিরাম নিতে গেলেন। কিছুক্ষনের মধ্যেই একটু ঠান্ডা হাওয়া ও সাথে রিমঝিম ধারা যেন তপ্ত শরীরকে শীতলতার প্রলেপ দিয়ে গেলো। হঠাৎই ট্রেন নিজের গতি কমিয়ে আনলো - জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি সিগন্যাল লাল।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন এই শাখায় সিগনালিং ব্যাবস্থা খুবই অনুন্নত ছিল। "One Train Only" নীতিতে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী একটি ও সোনামুখী থেকে মসাগ্রাম একটি ট্রেন চালানো হতো। এখন অবশ্য এই সমস্যা আর নেই এবং একাধিক গাড়ি চালানোর জন্য এই রেলপথ তৈরি। বামদিকে একটু বাঁক নিয়ে আপ লুপ লাইন ধরে সোনামুখী স্টেশনে ঢুকলো আমাদের ট্রেন। বাঁকুড়া মসাগ্রাম শাখার প্রথম পর্যায়ে, এই সোনামুখী পর্যন্তই ট্রেন চলতো। এখানে দুটি প্লাটফর্ম ও সাথে একটি থ্রু লাইনও রয়েছে। ট্রেন এখানে বেশ কিছুক্ষন থামলো, কারণ মসাগ্রাম যাওয়ার ট্রেনটির সাথে ক্রসিং এখানেই হবে। তার আগমনের জন্য একটু প্রতিক্ষা করতে হল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, কিছুদিন আগেই ২০২০-র ১৮ই জুলাই বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী পর্যন্ত বৈদ্যুতিকরনের কাজ সম্পন্ন হয়ে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের সূচনা করে দেওয়া হয়েছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক ট্রেন পরিষেবা শুরু হলেই হয়তো দেখা মিলবে বৈদ্যুতিক লোকাল ট্রেনের। বনগাঁ শাখার মত না হলেও ফাঁকা ট্রেনটায় এখান থেকে কিন্তু ভালোই যাত্রী সমাগম হল। ঘুগনি বিক্রেতার দেখা পাওয়া গেল, অজানতেই ঘটল জিভে জলের সঞ্চার, কিন্তু বাকি দুই অত্যন্ত স্বাস্থ্য সচেতন বন্ধুর উপস্থিতি ওই লোভনীয় ঘুগনির থেকে বঞ্চিত রাখল আমায়। হায় রে, রেলের এই চমৎকার যাত্রার অঙ্গ, এই মুখরোচক খানাপিনার ব্যাপারে এত ভাবনাচিন্তা কি মানায়!!! না মনে হয়....

৭৮০৫৬ ডাউন বাঁকুড়া মসাগ্রাম ডেমু অর্থাৎ মসাগ্রাম যাওয়ার নীল হলুদ ট্রেনটি কিছুক্ষন পরেই হুইসেল বাজিয়ে ঢুকল, সেটির আগমনের সাথে সাথেই আমাদের ট্রেন সোনামুখী ছেড়ে দিলো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই এসে গেলো হামিরহাটি হল্ট। লাল মাটির সোঁদা গন্ধ বুঝিয়ে দিল একটু আগেই প্রকৃতি এখানে বারিধারা বিসর্জন করে গেছে। এই স্টেশনের বিশেষত্ব বলতে আছে শুধু রাশি রাশি নিম গাছ আর তার থেকে প্রাণ জুড়নো হাওয়া। এর মিনিট পাঁচেক পরেই এলো শ্রীরামপুর, নামটা শুনে ঘাবড়ে যাবেন না যেন, এটি বাঁকুড়া জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, হুগলী জেলার বিখ্যাত শ্রীরামপুর শহরের সাথে এই জায়গার কোন মিল নেই। এক বন্ধু ট্রেনে ওঠা বিক্রেতার থেকে কিছু মিষ্টি কিনল। নাম না জানা সেই মিষ্টির স্বাদ যেন মুখে লেগে আছে। সাথে ছিল মশলা দেওয়া লেবু চা ও আমাদের রেল আড্ডা।

এই সবের মাঝেই পেরিয়ে গেলো বৃন্দাবনপুর। তারপর এলো ছান্দার। এই স্টেশনটির দুই ধার উঁচু হওয়ার দরুণ, স্টেশনঘরটিও বেশ খানিকটা ওপরে অবস্থিত এবং প্ল্যাটফর্ম অপেক্ষাকৃত নীচে। এই রেলপথে এটি একমাত্র এই ধরনের স্টেশন, যা সচরাচর মালভূমি এলাকায় রেল ভ্রমণে প্রচলিত দৃশ্যএবং এখান থেকে রেলপথের বেশ উঁচু-নিচু ওঠা-নামা লক্ষ্য করা যায়, রেলের পরিভাষায় যাকে gradient বলা হয়, যা মালভূমি এলাকার বৈশিষ্ট।

যাত্রাপথের শেষ ধাপে এসে উপস্থিত আমরা। ট্রেন এরপর বেলিয়াতোর ছাড়িয়ে, লাল মাটির বুকে দুইধারের সবুজ বনানীকে সঙ্গী করে, এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে। পার করলাম বেলবনি, নোবান্দা এবং বিকনা। বিকনা স্টেশন ছাড়ার পরই পেরলাম কাশফুল ঘেরা গঙ্কেশ্বরী নদীর সেতু। বর্ষা ও শরতের সন্ধিক্ষণে গঙ্কেশ্বরীর রূপ এক কথায় অপূর্ব।

ট্রেন ধীরে ধীরে ডানদিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে। আসতে আসতে ক্ষীণ থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে বড় বড় বাড়ি ঘর, একটি সুউচ্চ উড়ালপুল। খানিক পর থেকে আদ্রা-খড়গপুর শাখার বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে আমরা পৌঁছে গেছি বাঁকুড়ার খুব কাছাকাছি। আট কোচের লাল নীল সাদা রঙের ট্রেনটি আর একটু এগোতেই সাক্ষাৎ হলো ভেদুল উড়ালপুলের যার উপর দিয়ে গেছে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক - এটি বাঁকুড়া সিমলিপাল রোড নামেও পরিচিত। এরপরই রেললাইনটির দুইদিকে "BDR" (Bankura Damodar Railway) লেখা বাঁকুড়ার বিখ্যাত পোড়ামাটির ঘোড়ার মূর্তি পার করতেই বোঝা গেল পথ ফুরিয়েছে। আরো খানিকটা বাঁক নিয়ে কয়েকটি ক্রসিং পয়েন্ট ঝমঝম শব্দে পেরিয়ে নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগেই অর্থাৎ দুপুর তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটে ট্রেন পৌছালো বাঁকুড়া স্টেশন।

বাঁকুড়াতে কিছুটা সময় কাটিয়ে, কিছু ছবি তুলে একটু খাওয়া দাওয়া সারা হল। ইতিমধ্যেই সময় হয়েছে কলকাতা গামী ফিরতি ট্রেনের অর্থাৎ আরণ্যক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের। যাতে চেপে লালমাটির দেশকে বিদায় জানালাম। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়তেই হারিয়ে গেল মসাগ্রাম যাওয়ার বি ডি আর লাইন। ক্রমশ ঝাপসা হয়ে গেল বাঁকুড়া শহরও।

এগিয়ে চলেছি আবার শহরের পথে, কংক্রিটের জঙ্গলে। এই যাত্রার পাওয়ার খতিয়ান হল স্মৃতিবোঝাই করা ৩ ঘণ্টার স্বপ্নের সফর যা একঘেয়ে জীবনযাত্রার বিষন্নতা ও উদাসীনতা কে অবদমিত করার রসদ হয়ে বেশ কিছুদিন রয়ে যাবে....

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি লেখকের নিজস্ব তোলা।

রূপকথার রেলে সহ্যাদ্রির কোলে

সোমশুভ্র দাস

Ferroequinology - এ এক বিচিত্র Hobby বা সখ, রেল কে ভালোলাগা, ভালবাসা ও তা নিয়ে অধ্যাবসায়ই হল এই সখ পূরণের মূল মন্ত্র। ছোটবেলা থেকেই ট্রেনের প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ ছিল। ট্রেনে চড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেড়াতে যাওয়ার থেকেই হয়তো এর জন্ম। সেই সময়ের স্মৃতিগুলো এখনও নস্টালজিয়া হয়ে ভিড় করে মনে। শৈশব কালের রেল ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আজও স্মৃতির পাতায় কাহিনী রূপে সঞ্চিত। স্মৃতির অতলে আজও অমলিন আমার প্রথম ছোটরেল সফর, ঔরঙ্গাবাদ থেকে হায়দরাবাদ। সেই থেকেই ছোট ট্রেনের সাথে আমার রোমান্টিসিজমের শুরু। সেই ভালবাসার টানেই কোথাও, কখনও, কোনও ট্রেন ভ্রমণের পরিকল্পনায় ঢুকে পড়ে সেই ছোট ট্রেনের সফর। তেমনই একটি রেলকাহিনী শোনাব আজ।

১২ই জানুয়ারি ২০১৯, যাত্রা শুরু করলাম। আমার বেশির ভাগ রেল সফরে 'একলা চলো' নীতিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে কারণ এই প্যাশানের তথা পাগলামির সাথে পাল্লা দেওয়া অনেকের কাছেই একঘেয়ে বা অস্বস্তিকর। পরিকল্পনা মাফিক সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেসে চেপে পাড়ি দিলাম বিজয়ওয়াড়ার উদ্দেশ্যে। পরদিন ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০ টা বেজে ৪০ মিনিটে একেবারে সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিলো ট্রেন। ভালোবাসার বিষয় যখন সঙ্গে বিরাজমান তখন কি আর এত সহজে অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করা যায়, তাই আর দেরী না করে সঙ্গের ব্যাকপ্যাকটিকে স্টেশনের ক্লোক রুমে জমা রেখে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেললাম স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন ইঞ্জিনের ছবি সংগ্রহ করতে। ইঞ্জিন প্রেমে এতটাই বিভোর হয়ে ছিলাম যে কখন বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়েছে খেয়াল নেই, এদিকে ঘড়ির কাঁটা জানান দিলো মাদ্রাজ গামী জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সময় হয়ে এসেছে। এই রথে চড়েই পাড়ি দেবো বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের রাজধানী মাদ্রাজ তথা চেন্নাই। পরিকল্পনা ছিলো মাদ্রাজে রাত্রি যাপন করে পরদিন বিকেলে পুনরায় ট্রেনে চড়েই পৌঁছাবো শোনগোট্টি, উদ্দেশ্য ছিল দেশের রেল মানচিত্রের দক্ষিণতম 'ঘাট সেকশনের' সাথে পরিচয় করা। কিন্তু সরাসরি ট্রেনের টিকিট না পাওয়ার দরুন একই রাস্তা যেতে হলো তিন তিনটি ট্রেন বদলে। এই ট্রেন বদলের হ্যাপা সকলের বিরক্তির কারণ হলেও আমার মত রেল প্রেমীর কাছে এ খুবই আনন্দের ব্যাপার। একটির বদলে তিনটি ট্রেনে চড়ার মজা সাথে আবার উপরি পাওনা নেল্লাই এক্সপ্রেসের গার্ড কোচে যাত্রা। এইসব অনুভূতি একমাত্র একজন রেলপ্রেমীই অনুভব করতে পারবে।

শোনগোট্টি - কোল্লাম রেলপথের অপরূপ শোভা একটা সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণনা দাবি করে। এই ভ্রমণের পরবর্তী আকর্ষণ তথা নীলম্বুর রোড - শোরনুর রেলপথের অনবদ্য সৌন্দর্যের ইতিকথারও একই ভাবে ইতি টানতে হচ্ছে মূল পর্বে পৌঁছনোর জন্য।

বি - শ্রেনীর বাষ্প চালিত ইঞ্জিন

নেরল স্টেশনে ছোট্ট টয় ট্রেন

শোরনুর থেকে গরীব রথে রওনা দিলাম, লক্ষ্য বম্বে, থুড়ি নেরল থেকে মাথেরানের ছোট ট্রেন। ঠানে স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেন বদলে পৌঁছে গেলাম নেরল। ছোট্ট শহর নেরল হলো শৈলশহর মাথেরানের প্রবেশদ্বার, যার চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে সহ্যাদ্রি।

হাতে কিছুটা সময় থাকার দরুণ পাশেই নেরল ন্যারোগেজ্ শেডে একবার ঢুকে পড়লাম। শেডের সামনে এক দীর্ঘকায় বটবৃক্ষ যেন অতীতের নানান পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে দণ্ডায়মান। এখানকার আধিকারিক ও কর্মীদের বিনয়ী ব্যবহার এক কথায় অতুলনীয় যা আমাকে মুগ্ধ করে। এ কথা বলতেই হয় যে ওনারা আমাকে যথেচ্ছ ছবি তোলার অনুমতি দেন। আমাদের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে থেকে একটি বি - শ্রেনীর স্টিম ইঞ্জিন (B-Class) # ৭৯৪ এখানে আমদানি করা হয়েছিলো কয়েক বছর আগে, উদ্দেশ্য ছিল স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে টয় ট্রেন চালিয়ে আরো বেশি পর্যটকদের আকর্ষিত করা এবং সাথে বাড়তি উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা। কিন্তু ইঞ্জিনটির জরাজীর্ণ উপস্থিতি এই প্রকল্পের ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেরল শেড্ হলো ছোটো ছোটো লাল-হলুদ-সবুজ রঙের লোকোমোটিভের সম্ভার, এগুলি মূলত NDM1A। এদের উজ্জ্বল রং আবালবৃদ্ধবনীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনই একটি ইঞ্জিন দায়িত্ব পেলো আমাদের ৬ কামরার ট্রেনকে নেতৃত্ব দেওয়ার।

সময় তখন ঠিক পৌনে তিনটে, হুইসেল বাজিয়ে ধীর গতিতে লৌহ পাতের ওপর গড়ালো ছোট্ট ট্রেনের চাকা। ট্রেনের প্রত্যেকটা কোচ সুসজ্জিত, তা প্রথম শ্রেণীর আরামদায়ক সিটই হোক বা সাধারণ শ্রেণীর কামরা, বাতানুকুল কোচে রয়েছে সুন্দর বাদামী রঙের পর্দা। এত সুন্দর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য। বাইরে থেকে ট্রেনের কোচগুলি মুড়ে দেওয়া হয়েছে নজর কাড়া নানান রঙের ভিনাইলে। সামনের মনোরম দৃশ্য লেন্সবন্দি করব বলে ছোট্ট কামরায় জানালার পাশে বসে পড়লাম। ছোটবেলা থেকেই ট্রেনের জানালার পাশের সিটটি নিজের দখলে রাখার প্রচেষ্টা আজও বৃথা গেল না। ছোট্ট এই ট্রেনটির প্রতিটি কামরার জানালা যথেষ্ট বড়ো ও চওড়া যার প্রধান কারণ হলো যাত্রীরা প্রকৃতি প্রেম থেকে যেন কোনো ভাবেই বঞ্চিত না হয়। আমিও সেই সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজেকে প্রকৃতি প্রেমে নিমজ্জিত করলাম। ট্রেন ছাড়ার পর লক্ষ্য করলাম যে প্রতি কামরার শেষ দরজায় রয়েছেন একজন করে প্রহরী বা কোচ এটেনডেন্ট যাদের দায়িত্ব যাত্রারত ট্যুরিস্টগণ যেন ট্রেন চলাকালীন উদ্দীপনার জেরে কোচের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে না ছোটাছুটি করেন

নেরল ডিজেল লোকোমোটিভ শেড

সুসজ্জিত মাথেরান রেলের কামরা

সহ্যাদ্রির কোল ঘেঁষে মাথেরানের পথে...

জুম্মাপট্টি স্টেশনে ডিপার্টমেন্টাল রেকের সাথে ক্রসিং

তা খেয়াল রাখা যাতে করে ট্রেনের ভারসাম্য বিঘ্নিত না হয় এবং কোনরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে। এই সতর্কতাবাণী প্রত্যেক কোচেই উল্লিখিত যা আমাদের যাত্রার প্রাক্কালেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে পাহাড়ি এই টয় ট্রেন। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য দেখে দুই চোখে যেন এক নির্মল প্রশান্তির প্রলেপ লেগেছে। বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে পাহাড়ের চটিতে উঠতে থাকা এই রেলপথেই আছে পৃথিবীর তীক্ষ্ণতম বাঁকটি। মোট ২৮১ টি বাঁক রয়েছে এই রোমাঞ্চকর যাত্রাপথে। চড়াই অতিক্রম করতে করতে প্রথম স্টেশন জুম্মাপট্টীতে এসে পৌঁছলাম। কাঠবাদাম, কুল ও ঠান্ডা পানীয় বিক্রেতারা তাদের রুজি রোজগারের তাগিদে রোজনামচায় ব্যস্ত। কতিপয় বিদেশী পর্যটক এই ফলাহারে যোগদান করলেন। কোনো ক্রসিং না থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন দাঁড়িয়ে রয়েছি এই কথা জিজ্ঞেস করতে জানা গেলো ডিপার্টমেন্টাল রেক্ ডাউনহিল আসছে। তোফা, এতো উপরি পাওনা, অর্থাৎ আরেকটি ট্রেনকে স্বচক্ষে দেখা ও সুযোগ মত একটু ছবি তোলা। জলের ট্যাঙ্ক সহ আরো কিছু সামগ্রী নিয়ে দুলকি চালে এসে পৌঁছলো উল্টো দিকের ট্রেনটি। সিগন্যাল হতেই অবিলম্বে পথচলা শুরু হল আবার। রেলপথের বেহাল দশা ও সাথে ঘন ঘন বাঁকের দরুন ট্রেনের গতি বহু জায়গায় ৫ কিমি প্রতি ঘন্টায় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবল বর্ষণে বার বার বিধ্বস্ত হয়েছে এই রেলপথ। ফি বছর পাহাড়ি ধস্ চরম আঘাত হানার ফলে প্রতি বর্ষায় পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু সমস্ত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে বারংবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে মাথেরান লাইট্ রেলওয়ে।

শতাব্দী-প্রাচীন এই রেলপথ নির্মিত হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০১ থেকে ১৯০৭ সালের এর মধ্যে স্যার আদমজি পীরভুঁই ও তাঁর পুত্র আব্দুল হোসেন আদমজি পীরভুঁই-এর নেতৃত্বে ও মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার এভারার্ড ক্যালথ্রপের প্ল্যান মাফিক মাথেরান লাইট্ রেলওয়ে বাস্তবায়িত হয়। ১৯০৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত জার্মানির Orenstein & Koppel নির্মিত 0-6-0T বাষ্প চালিত ইঞ্জিন এখানে ব্যবহৃত হয়, বর্তমানে যার একটি নেরল স্টেশনে বহু স্মৃতির বাহক হয়ে প্রদর্শিত রয়েছে। কালের বিবর্তনে ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের জায়গায় ৪ -হুইল সেটের ডিজেল ইঞ্জিনের (NDM1 / NDM1A / NDM6) প্রবেশ ঘটেছে। মধ্যম রেলের অন্তর্গত এই রেলপথের একটি

রুজির টানে...

প্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতিচারণ

নেরলে সংরক্ষিত ১৯০৭ সালে নির্মিত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

জুম্মাপট্টি স্টেশনে ক্রসিং...

ওয়ান কিস টানেল

ওয়াটার পাইপ স্টেশন

বিশেষত্ব হল অশ্বক্ষুরাকৃতি এমব্যাংকমেন্ট/Horseshoe Embankment যা মাউন্ট ব্যাড়ির নিকট একটি রিভারসিং স্টেশনের প্রয়োজনীয়তা খর্ব করেছে। এই এমব্যাংকমেন্টের মধ্যে দিয়েই রুটের একমাত্র সুড়ঙ্গ ওয়ান কিস টানেলের সাথে সাক্ষাৎ হল। এই বিচিত্র নামের তাৎপর্য এর অতি স্বল্প পরিসর যা হল মাত্র ৩৫.৬৭ মিটার।

যাত্রাপথের নিবিড় জঙ্গল, শান্ত প্রকৃতি যেন দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা ও ব্যস্ততার এক বিপরীত ধারা। পথ চলতে চলতে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে হারিয়ে গেছি কোন এক অজানা দেশে যেখানে সময়ের বাধা নেই, হিসেবের পরিমান নেই আর কোনো পিছু টান নেই। কেবল রয়েছি আমি, প্রকৃতি আর এই ছোট রেল। সময়কে মুঠোতে

সহ্যাদ্রির বনানী পথে...

বন্দী করতে চাইলেও সেই সাধ্য কারোর নেই। সময়ের স্রোতে আমরা সকলেই আওয়ান, যার ব্যতিক্রম এই ছোট রেলও নয়। সঠিক সময় সূচী মেনেই ট্রেন এসে পৌঁছালো ওয়াটার পাইপ স্টেশনে। স্টেশনের নাম অদ্ভুত হলেও জঙ্গলের মাঝে সে এক আশ্চর্য হল্ট। এই স্টেশনের নামের উৎস নাকি জল সরবরাহকারী পাইপের উপস্থিতির কারণে। অতীতে স্টীম ইঞ্জিনের জলের চাহিদা এখানেই মেটানো হতো।

এখানে অপেক্ষারত ট্রেনের সাথে টোকেন বিনিময়ের পর ট্রেন ছেড়ে এগিয়ে চললো গন্তব্যের দিকে। নীল আকাশের ক্যানভাসে মাথা উঁচিয়ে থাকা সবুজ বনানীর ফাঁক দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদের ঝিকিমিকি আর অজস্র পাখির কলকাকলি, শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি এক মনমুগ্ধকর আবহের সৃষ্টি করেছে। পলাশ ও নানান বৃক্ষের ভিড়ে হারিয়ে যায় শহুরে বৃত্তের কোলাহল, দূষণ, ব্যাস্ততা ও দৌড়ঝাঁপ। জীবন এখানে মন্থর। নির্মল বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়ে চিন্তা ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থকতা অনুভব করছিলাম। প্রকৃতিমুখর এই স্টেশন ছেড়ে যেতে মন সায় দেয় না, কিন্তু রাস্তা এখনও যে বাকি, থেমে থাকলে চলবে না, তাই এগিয়ে চলা। যতো আমরা শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছি ততো নেরল শহর আরও ক্ষুদ্রাকৃতি রূপ নিচ্ছে। হঠাৎই চমকে উঠলাম পাহাড়ের কোলে এক প্রকাণ্ড, গগনচুম্বি গণেশমূর্তির দর্শনে - সে এক অবাক করা বিশ্বাস ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের দৃশ্য। শিশু থেকে কিশোর, নবদম্পতি থেকে বর্ষীয়ান জুটি - সকলের চোখে মুখে এক আশ্চর্য বিস্ময়। সকলেই প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ ক্যামেরা বন্দি করতে উদ্যত। ইতিমধ্যে আমাদের কোচের কচিকাঁচারা যাত্রার আনন্দ শতগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। শিশুর নিষ্পাপ সরলতা এবং প্রকৃতির মাধুর্য আমাদের যেন অন্য এক জগতে নিয়ে গেছে, যেখানে নেই একে

সিদ্ধিদাতার সুবিশাল মূর্তি

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গা বেয়ে ঘুমের রেল লাইন...

মাথেরানের পথে ছুট ঝিক ঝিক টয় ট্রেন...

কঠিন গিরিপথ ধরে...

আমান লজ স্টেশন

মাধুর্য আমাদের যেন অন্য এক জগতে নিয়ে গেছে, যেখানে নেই একে অপরের প্রতি কোনো গ্লানি, নেই কোনো স্বার্থপরতা, রয়েছে শুধু ভালোবাসা আর অনাবিল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।

দিনের আলো প্রায় ম্লান হয়ে এসেছে। দিনের শেষে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য মনের মণিকোঠায় চিরদিনের মত রয়ে গেল । বিকেল পেরিয়ে আমাদের টয় ট্রেন অমন লজ স্টেশন প্রবেশ করলো। এখান থেকেই নিচে নামার গাড়ি পাওয়া যায়। নেরল থেকে মাথেরানের ১২ মাইল পথ অতিক্রম করতে ট্রেনের সময়সারণী অনুসারে আড়াই ঘন্টা লাগার কথা কিন্তু এই ৯ মাইল আসতেই ৩ ঘন্টার বেশি সময় লেগে গেছে। যাত্রা মনোরম হলেও বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরার টাইম, অনুমতি দিল না বাকি ৩ মাইল সফরের ঝুঁকি নিতে, অগত্যা এখানেই থামতে হল।

অমন লজ স্টেশন চত্বরে প্রথমেই "ওয়েলকাম টু মাথেরান" বোর্ড দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সবুজে আবৃত স্টেশনের লাইন সংলগ্ন একটি সেকালের সীমাফোর সিগন্যাল আজও বিদ্যমান। আজ প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে তবু তার নির্বাক উপস্থিতি ফেলে আসা অতীত ব্যক্ত করে। মাথেরানের অর্থ হল মাথার ওপরের বন আবার মারাঠি

যাত্রা পথের শেষে...

ভাষায় মাথেরান বলতে বোঝায় মাদার ফরেস্ট। ওয়ারলী জনজাতির মানুষেরা এই অঞ্চলে বসবাস করে যাদের পরম্পরাগত লোকচিত্রকলা খ্যাতিলাভ করেছে। এই ছোট্ট শহরের অবস্থান সমুদ্রতল থেকে ৮০৩ মিটার উচ্চতায়। শীতের সাথে বর্ষার মাথেরানের অনেকটাই ফারাক। বর্ষায় সহ্যাদ্রির কোলে চলে মেঘের লুকোচুরি, বসে ঘন সবুজের মেলা, পাহাড়ি ঝোরায় থাকে সিক্ত পথ। সেই স্নিগ্ধতার পরশ না পেলেও তা কল্পনা করে নেওয়া খুব একটা কঠিন নয়। তবে শীতের আমেজে মিঠেকড়া রোদের ওম জড়ানো মাথেরানের রূপ ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। সৃষ্টিকর্তা তার ভান্ডার থেকে অফুরান সৌন্দর্য্য ঢেলে দিয়েছে।

মাথেরানে পেট্রোল বা ডিজেলচালিত যানবাহন নিষিদ্ধ তাই রঙবেরঙের রিক্সা স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছে যাত্রীদের শৈলশহরের অন্দরে প্রবেশের জন্য। সন্ধ্যে নামার মুখে, নেরল ফেরার গাড়ির সন্ধানে দেরি হল না বিশেষ এবং যে চড়াই উঠতে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় লাগল তা নামতে সময় নিল মাত্র পঁচিশ মিনিট। অকস্মাৎই যেন শেষ হয়ে গেল প্রকৃতির আবেশ মাখা এই ছোটো রেলের মন মাতানো যাত্রা।

এবার ঘরে ফেরার পালা.... বিগত ১০ দিনের স্মৃতির সম্ভার নিয়ে কল্যানের উদ্দেশে লোকাল ট্রেনে উঠলাম। জ্ঞানেশ্বরীর বাতানুকুল কামরায় ছিল ক্লান্তি মেটানোর ও স্মৃতি রোমন্থনের অসীম অবকাশ। নেরল - মাথেরান ছোট ট্রেনের সফর সত্যিই এক অনন্য অভিজ্ঞতা। বিস্তীর্ণ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে লালমাটির ছোঁয়ায়, মায়াবী রোদ্দুরের লুকোচুরির মাঝে, এই রেল পথ ঠিক যেন শিল্পীর আঁকা এক ছবি। ঢেউখেলানো সবুজ পাহাড়, প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য আর মায়াবী এই ট্রেন বারে বারে ফিরে আসার হাতছানি দেয়। এই চিরসবুজ অরণ্য, পাহাড় ও টয় ট্রেনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলাম- "আবার আসিব ফিরে"....

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমস্ত ছবি লেখকের তোলা।

ব্রডগেজ

ইএমডি -র সাতকাহন

বরুণদেব শর্মা

ভারতীয় রেলের বর্ণময় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় জুড়ে রয়েছে আধুনিকীকরনের নানান প্রচ্ছদ, যার মূল ধারকবাহক হল লোকমোটিভ ও তার বিবর্তনের কাহিনী। স্টীম থেকে ডিজেল, ডিজেল থেকে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন - রেল সাক্ষী এই পরিবর্তনের। কালের নিয়মে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের কার্যকারিতা ফুরিয়েছে, ডিজেলের স্বর্ণযুগ এখন অতীতের স্মৃতি মাত্র, 'বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে ভর করেই ত্বরান্বিত হচ্ছে রেলের 'মিশন রফতার'।

কিন্তু এই গতির প্রতিযোগিতায় অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিল WDP4 ইঞ্জিন - যেটি আদতে একটি ডিজেল লোকোমোটিভ। শুনতে অবাক লাগলেও বাস্তব এইটাই। তাই আমাদের জেনে নিতে হবে কি এই WDP4 ইঞ্জিন? কি এর বিশেষত্ব? জানতে হলে রিভার্স গিয়ারে চলুন ফিরে যাই কিছুটা অতীতে। জেনে নিই আমাদের দেশে EMD -র ইতিবৃত্ত।

একবিংশ শতাব্দী ভারতীয় রেলে নিয়ে এল এক নতুন চাহিদা, ভারতীয় রেলে কয়েক দশক ধরে শাসন করা Alco -র হঠাৎই ঘটল ইন্দ্রপতন, তবুও, ভারতীয় রেলের সংসারে এদের উজ্জ্বল উপস্থিতি তখনও পুরোপুরি ফিকে হয়ে যায়নি। কিন্তু গতি, জ্বালানির সদ্ব্যবহার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের ত্রিমুখী উদ্দেশ্য পূরণে আমাদের দেশে ঘটল GM এর প্রত্যাবর্তন WDG4 ও WDP4 -এর হাত ধরে।

এদের প্রযুক্তিগত প্রগতির নেপথ্যে রয়েছে 2-stroke, 16-cylinder, Turbo Supercharged ডিজেল ইঞ্জিন (WDG5 ব্যতীত, যেটিতে রয়েছে 2-stroke, 20-cylinder, Turbo Supercharged ইঞ্জিন) যা এই লোকোমোটিভগুলির হৃদযন্ত্রের সমতুল্য। Turbo Supercharged ইঞ্জিনের মাহাত্য হলো, এটি হাওয়ার ঘনত্ব বাড়িয়ে ইঞ্জিনে প্রবেশ করায়, যার ফলে সম্ভব হয় জ্বালানির সঠিক প্রজ্বালন আর নির্গত দূষিত ধোঁয়ার পরিমাণের ওপর নিয়ন্ত্রণ। এই সকল বিশেষত্বগুলি লোকোমোটিভের উৎকর্ষতা ও দক্ষতার উত্তম নিদর্শন রাখে। এছাড়াও এই ইঞ্জিনগুলির জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা ৬১০০ লিটার (WDG5 এর ক্ষেত্রে যা ৮০০০ লিটার) যা ALCo নির্মিত লোকোমোটিভের থেকে (WDM3D ব্যতীত) অনেক বেশি।

উত্তর আমেরিকার জেনারেল মোটর্সের সাথে ভারতীয় রেলের সম্পর্ক অনেকদিনের, প্রথম ভারতীয় রেলের জেনারেল মোটর্সের ইএমডি আসে মিটারগেজের YDM3 ও YDM5 শ্রেনীর লোকোমোটিভ, তবে এরপর আর কোনো মিটারগেজের লোকোমোটিভ জেনারেল মোটর্স থেকে আসেনি, যা যা ভারতীয় রেল এনেছে পরবর্তীতে সবই ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, এবং এই ইএমডি লোকোমোটিভ ভারতীয়

রেলকে অনেক সুদূরপ্রসারী পরিষেবা দিয়ে চলেছে এখনো। একনজরে দেখে নেওয়া যাক ভারতীয় রেলে ব্যবহৃত, জেনারেল মোটর্স নির্মিত বিভিন্ন শ্রেনীর, ব্রডগেজ ইএমডি লোকোমোটিভের প্রকারভেদ :

WDM4 লোকোমোটিভ : ১৯৬২ সালে জেনারেল মোটর্স থেকে আমদানি করা এই ইঞ্জিনগুলি মূলতঃ সুপারফাস্ট ট্রেন পরিচালনার কাজে লাগানো হয়। সেরকমই ১৯৬৯ সালে ভারতের প্রথম রাজধানী এক্সপ্রেস অর্থাৎ হাওড়া-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের যখন যাত্রা শুরু হয়, তখন এই WDM4 লোকোমোটিভই থাকত তার দায়িত্বে। এই ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ১৪০ কিমি/ঘণ্টা, যার ফলেই রাজধানীকে সঙ্গে করে সর্বোচ্চ ১৩০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ছুটতে পারতো এই ইঞ্জিন। এর কিছু প্রযুক্তিগত বিশিষ্টের মধ্যে অন্যতম হল, এগুলি ডিসি ট্র্যাকশন মোটর সমৃধ্য, ২৬০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ও ১৮.৮ টন আক্সেল লোডযুক্ত ইঞ্জিন। একমাত্র মুঘলসরাই শেডই এই WDM4 লোকোগুলি রাখার দায়িত্বে ছিল। ইএমডি -র এই শ্রেনীর ইঞ্জিনগুলি তাদের সমসাময়িক ALCo ইঞ্জিনগুলির থেকে প্রযুক্তিগত মানে কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল। তবে তখন জেনারেল মোটরস্ প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে রাজি না হওয়াতে সেই সুদূর আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ার এনে এই লোকোমোটিভের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো, যা ছিল খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তাই ভারতীয় রেল এই ইঞ্জিনের ব্যবহার আস্তে আস্তে কমাতে থাকে। বর্তমানে দিল্লির রেল মিউজিয়াম ও বারাণসীর ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (DLW) তে একটি করে WDM4 লোকোমোটিভ সংরক্ষিত আছে।

WDG4 লোকোমোটিভ : এরপর ১৯৯৭ সালে পুনরায় ভারতীয় রেল জেনারেল মোটর্স থেকে ইএমডি GT46MAC মডেলের ইঞ্জিন আনায়, তবে এগুলি একদম অত্যাধুনিক টেকনোলোজি সম্পন্ন 3-phase ডিজেল-ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ ছিল, ৪০০০ অশ্বশক্তির উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এই লোকোমোটিভ গুলি মূলতঃ পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালন করার জন্য আমদানি করা হয়েছিল। ততদিনে ALCo লোকোমোটিভের প্রযুক্তি পেছনের সারিতে যেতে শুরু করেছে। এছাড়া কনভেনশনাল AC-DC ট্রান্সমিশনে পরিবর্তন আনতে চাওয়াতেই এই ইএমডি লোকোমোটিভ আনে ভারতীয় রেল। এই শ্রেনীর লোকোমোটিভের কিছু প্রযুক্তিগত সুবিধা রয়েছে। যেমন, এগুলি

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

সম্পূর্ণরূপে 3-phase ডিজেল-ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন হওয়াতে, এতে রয়েছে AC-AC ট্রান্সমিশন তাছাড়া, এর মোট আক্সেল লোড ২১ টন হওয়ার জন্য খুব সহজেই ভারী পন্য পরিবহনের কাজে লাগানো যায় এবং সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটার চালিত লোকোমোটিভ হওয়ায়, এর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় EM2000 নামের সফটওয়্যার দিয়ে। এই ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ গতিবেগ ১২০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। এর বগির গঠন হল Co-Co। এটি চালানো হয় তৎকালীন উন্নত GTO প্রযুক্তির দ্বারা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ভাবে, জেনারেল মোটর্স তাদের প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে সম্মত হয় ও বারাণসীর ডিজেল কারখানায় এই লোকোর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা হয়। যখন ১৯৯৭ সালে এই ইঞ্জিন প্রথম আমদানী করা হয়েছিল তখন মোট ২১খানা প্রোটোটাইপ ইঞ্জিন এসেছিল যার মধ্যে ৯টা (ক্রমিক সংখ্যা ১২০০১-১২০০৯) তৈরি ইঞ্জিন এসেছিল, আর বাকি ১২টা (ক্রমিক সংখ্যা ১২০১০-১২০২১) কিট হিসেবেই আমদানী হয়, যেগুলো পরবর্তী সময়ে DLW বারাণসীতে assemble করা হয়।

পরেরদিকে যে WDG4 গুলি তৈরি হয়েছে সেগুলি প্রযুক্তিগতভাবে আরো উৎকৃষ্টমাণের, যেমন ৪৫০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন, বেশি ট্র্যাক্টিভ এফর্ট, চওড়া জানালাযুক্ত কেবিন ও IGBT প্রযুক্তি সম্পন্ন। এই উন্নত WDG4 গুলির EMD নাম GT46ACe এটির অন্যতম একটি দিক হলো ব্রেক ব্লেন্ডিং অর্থাৎ এয়ার ব্রেকের সাথে ডায়নামিক ব্রেকের একযোগে ব্যবহার, যার ফলে কেবল মাত্র এয়ারব্রেকের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা গেছে ও রোধ করা গেছে অতিরিক্ত বিদ্যুতের অপচয়। তবে পুরানো যে WDG4 গুলি পরিষেবা দিচ্ছে তাদের টেকনিকাল ওভারহলিং এর সময় ট্র্যাকশন কনভার্টারে GTO Thyristor বদল করে IGBT লাগানো হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, GTO ও IGBT এমন দুই প্রযুক্তি যার সাহায্যে সিঙ্গেল-ফেজ এসি বিদ্যুৎকে থ্রি-ফেজ এসিতে রূপান্তরিত করা যায় যা সরাসরি ট্র্যাকশান মোটরে সরবরাহ করা হয়। এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে থ্রি-ফেজ মোটরের কার্যকারিতা ডিসি মোটরের অপেক্ষায় অনেকগুণ অধিক, তাছাড়াও থ্রি-ফেজ মোটরের রক্ষণাবেক্ষণ অনেকটাই সাশ্রয়পূর্ণ। গুডস ইএমডি অর্থাৎ এই ইঞ্জিনগুলির নম্বর শুরু হয় যথাক্রমে ১২xxx ও ৭০xxx। কর্ণাটকের হুবলী ডিজেল লোকো শেড প্রথম এই WDG4 ইঞ্জিন রাখা শুরু করে ।

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

WDG4D লোকোমোটিভ : ২০১৩ সালে RDSO ও DLW যৌথ প্রচেষ্টায় দুই কেবিন বিশিষ্ট WDG4D শ্রেনীর লোকোমোটিভ তৈরি করা হয়। এক কেবিন বিশিষ্ট লোকোমোটিভগুলির সামনের হুড লম্বা থাকার দরুণ, অধিকাংশ সময় দৃশ্যমানতার সমস্যা অভিযোগ জানাতেন লোকো চালকরা, তাই সেই সমস্যা দূর করতে এই WDG4D শ্রেনীর লোকোমোটিভের আবির্ভাব। WDG4 এর থেকে এই লোকোগুলির মূল পার্থক্য এর কেবিনে - পরিবর্তন আনা হয়েছে কন্ট্রোল স্ট্যান্ডে এবং কেবিন আরো আরামদায়ক করা হয়েছে মূলত পরিসর বৃদ্ধি ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। অশ্বশক্তির নিরিখে (৪৫০০) এই লোকোগুলি পরবর্তী কালের WDG4 এর সমতুল্য। লোকোর ওজন প্রায় ১৩০ টন, কাজেই ভারী পণ্য পরিবহনে সক্ষম। সর্বশেষ নির্মিত WDG4Dটি (৭০৮৮২) ২০১৯ সালে তৈরি হয়েছিল এবং এটি বর্তমানে শিলিগুড়ি লোকোশেডের অন্তর্গত।

ছবিঃ সান্তলান মাহান্তো। উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত।

WDG5 লোকোমোটিভ : ২০১৩ সালে DLW WDG4 এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী আরেকটি লোকোমোটিভ তৈরি করেছিল, তবে এটি GT46MAC নয়, এটি ছিল GT50AC মডেলের - ৫০০০ অশ্বশক্তির এই লোকোমোটিভের আক্সেল লোড ২২.৫ টন ও মোট ওজন ১৩৪ টনের হওয়ার জন্য ভারী পণ্য পরিবহনে একে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু অতিরিক্ত ওজন ও দৈর্ঘের দরুণ বগিতে অনেক সমস্যা দেখা দেয় যার জন্য এই শ্রেনীর ইঞ্জিনগুলি কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অধিকাংশ লোকোশেডই এর রক্ষনাবেক্ষণ করতে অস্বীকার করে। এই কারণবশতঃ মাত্র ৭টি ইউনিটই তৈরি করা হয়েছিল যেগুলো এখন রয়েছে পশ্চিম রেলওয়ের সবরমতি লোকোশেডের অধীনে। এই লোকোমোটিভ গুলির ক্রমিক নম্বর ৫০০০x দিয়ে শুরু হয়।

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

WDP4 লোকোমোটিভ : পণ্যবাহী ইএমডির পাশাপাশি ভারতীয় রেল ২০০১ সালে জেনারেল মোটর্স থেকে GT46PAC মডেলের ১০টা ইঞ্জিন (২০০০০ -২০০০৯) আমদানি করে দ্রুতগতির যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর উদ্দেশ্যে। ৪০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন এই ইঞ্জিনগুলি, যাত্রীবাহী ট্রেনকে অনায়াসে ১৬০ কিমি/ঘণ্টায় নিয়ে যেতে সক্ষম, তার প্রধান একটি কারণ হলো এই ইঞ্জিনের বগির গঠন। ভারতের একমাত্র এই লোকোমোটিভই Bo1-1Bo শ্রেণীর বগি ব্যবহার করে। মূলত অপেক্ষাকৃত কম আক্সেল লোড (১৯.৫ টন) এই ইঞ্জিনগুলির দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার কারণ। দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের হুবলী শেডই প্রথম এই লোকোগুলি রাখতে শুরু করে। এক্ষেত্রেও জেনারেল মোটর্স তাদের প্রযুক্তিকৌশল হস্তান্তর করার দরুণ বারাণসীর ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা এই লোকোরও বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। তবে ২০০৭-এর পর আর এই লোকোমোটিভ তৈরি হয়নি, কারণ প্রধানত চড়াইয়ে হুইল স্লিপের নানান ঘটনা। সাথে ২৪ কামরার দৈর্ঘের ট্রেনের ক্ষেত্রে ত্বরণের সমস্যা ও সামনের লম্বা হুড থাকার দরুণ, অধিকাংশ সময় দৃশ্যমানতা হ্রাস। সম্প্রতি ট্যালগো ট্রেনের ১৮০ কিমি/ঘণ্টা গতিবেগ পরীক্ষার সময়ও এই WDP4 শ্রেণীর ইঞ্জিনই ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমানে কেবলমাত্র হুবলি, কৃষ্ণরাজাপুরম, ভগত কি কোঠি আর শিলিগুড়ি শেডগুলিতেই এই ইঞ্জিন রয়েছে। এই শ্রেনীর শেষ উৎপাদিত ইঞ্জিনের ক্রমিক সংখ্যা হলো ২০১০৩।

WDP4B লোকোমোটিভ : ২০০৭ সালে DLW তে WDP4 এর হুইল স্লিপের ঘটনা এড়ানো ও WDP4 কে আরো উচ্চ অশ্বশক্তি সম্পন্ন (৪৫০০) বানাতে, WDP4B এর উৎপাদন শুরু হয়। এটি জেনেরিক ভাবে GT46ACe নামে পরিচিত। ট্র্যাকশন মোটরের সংখ্যা বাড়িয়ে Co-Co বগি করা হয়, যার ফলস্বরূপ লোকোমোটিভ ভারী হওয়ায় হুইল স্লিপের সমস্যাকে অতিক্রম করা গেছে। কিন্তু চালকদের দৃশ্যমানতার সমস্যাটা সেই বিদ্যমান। কিছু WDP4 কে পরবর্তী সময় WDP4B তে পরিবর্তন করা

বারাণসীর ডিজেল ইঞ্জিন কারখানার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নির্মিত ইএমডি লোকোমোটিভ নং ৪০০৭৯ 'প্রতীক'।
ছবিঃ সোমতন্ত্র দাস।

বারাণসীর ডিজেল ইঞ্জিন কারখানায় নির্মিত ১২০০০তম উচ্চ অশ্বশক্তি সম্পন্ন (HHP) ইএমডি লোকোমোটিভ নং ৪০১২২।
ছবিঃ [illegible] রায় চৌধুরী

১৫০তম গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গুটি শেডের বিশেষ প্রতিস্থাপনা। ৪০৩২৮ ক্রমিক সংখ্যার WDP4D লোকোমোটিভে গান্ধী শিল্পকলা। ছবিঃ সোমশুভ্র দাস।

DLW, বারাণসী নির্মিত ১৫০০তম উচ্চ অশ্বশক্তি সম্পন্ন (HHP) লোকোমোটিভ নং ৪০২৩৫ 'গৌরব'। ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস।

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

ছবিঃ শুভদ্যুতি বোস

হয়। WDP4B তে HOG প্রযুক্তি আনা হয়, যা ডিজেল ইঞ্জিনে প্রথম। এটির মাধ্যমে EOG বা জেনারেটার কার না চালিয়েই কোচের এ সি, আলো ও পাব্লিক হিটার চালানো যায়।

WDP4D লোকোমোটিভ : ২০১০ সালে নতুনভাবে RDSO ও DLW এর নকশায় দুই কেবিনবিশিষ্ট লোকোমোটিভ তৈরি হলো WDP4 শ্রেনীকে ভিত্তি করেই। এতে করে লোকো চালকদের দৃশ্যমানতার সমস্যার পূর্ণ সমাধান পাওয়া গেল। এই শ্রেনীর লোকোমোটিভে বেশ কিছু প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও আনা হয় যেমন, চওড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কেবিন, অত্যাধুনিক ডিজিটাল প্যানেল ও সুইচ দ্বারা সুসজ্জিত কন্ট্রোল স্ট্যান্ড। এছাড়াও, ২০.৫ টন আক্সেল লোড এবং ৪৫০০ অশ্বশক্তির অধিকারী এই লোকোমোটিভ অনায়াসে ঘণ্টায় ১১০ কিমি বেগে একটা ২৪ কোচের যাত্রীবাহী ট্রেনকে নিয়ে ছুটতে সক্ষম। এই ইঞ্জিনের ওজন মোট ১২০ টন। সর্বশেষ নির্মিত WDP4D লোকোমোটিভটি (৪০৬০৮) নিউ-গুয়াহাটি শেডের অধীনে। ৪০০১৪ ও ৪০০২৬ হলো প্রথম দুই WDP4D। এই শ্রেনীর ক্রমাগত সিরিজ শুরু হয়েছে ৪০০৮৬ থেকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, DLWর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তৈরী ইএমডি লোকোমোটিভ ৪০০৭৯ ('প্রতীক') এবং DLW-র প্রস্তুত করা হাজারতম ও দেড় হাজারতম উচ্চ অশ্বশক্তি সম্পন্ন (HHP) লোকোমোটিভ যথাক্রমে ৪০১২২ এবং ৪০২৩৫ ('গৌরব') হলো, ভারতীয় রেলে ইএমডির স্বর্ণযুগের তিন স্মারক।

উপসংহার:- DLW ইএমডি উৎপাদন শুধুমাত্র ভারতীয় রেলের জন্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও শ্রীলঙ্কান রেলের জন্যও DLW ইএমডি লোকোমোটিভ প্রস্তুত করে থাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির আমুল পরিবর্তনের কারণে এখন বন্ধ সমস্ত ডিজেল তথা ইএমডির উৎপাদন। 'বৈদ্যুতিকরণের ক্ষিপ্র গতির অভিমুখে EMDও আজ ব্রাত্য। WAG11 শ্রেণীর ইঞ্জিনের নির্মাণে লাগানো হচ্ছে WDG4 এর আডার ফ্রেম, তাই কোভাল লাইফ শেষ না হলেও সরকারি নীতিগত সিদ্ধান্তের জেরে, EMD -র বিসর্জনের দামামা বেজে গেছে। পুরোনো ALCo-র বাতিলপর্বের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে EMD -র অপসারণের প্রস্তুতি। দেশের ডিজেল যুগের অন্তিম লগ্নে আকস্মিক ঢুকে পড়েছে GE নির্মিত Evolution series এর WDG4G আর WDG6G ইঞ্জিন। তবে এগুলিও হয়ত খুব শীঘ্রই এই অন্তর্জলি যাত্রায় শরিক হবে....

তথ্যসূত্র : ১) Diesel locomotive Maintenance Manual,Issued by RDSO. ২) Monthly Diesel locomotive availability targets published by all zonal PCMEs. প্রচ্ছদ ছবিঃ সোমশুভ্র দাসের সৌজন্যে

বোগিবিলের স্বপ্নসফরে...

উত্তর-পূর্ব ভারতের সৌন্দর্য নিয়ে আলাদা করে কিছু বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রকৃতি, তার মাঝে পাহাড় ও নদীর সমন্বয়ে উত্তর পূর্ব ভারত সবসময়ই একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। এখানে একবার এলে বারবার আসতে হবেই। এর ব্যাতিক্রম মেলা ভার। তাই ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে চার বন্ধুর হঠাৎ ঠিক করা উত্তর-পূর্ব ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন লেখক ও রেলপ্রেমী সৌরভ কুমার দাস।

পুজোর ঠিক মুখে মুখে সমস্ত শহর যখন মা'কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেইসময় চেপে বসলাম কলকাতা থেকে গরীব রথ এক্সপ্রেসে। পরদিন গুয়াহাটি হয়ে রঙ্গিয়া পৌঁছে সেখানে রাত্রিযাপন করে, তার পরের দিন রাত ৯টা বেজে ২০ মিনিটের ১৫৬১৩ লচিত এক্সপ্রেস ধরলাম। গন্তব্য হারমতি জংশন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ট্রেন একবারে লঙ্কা আর শাকের গন্ধে ম ম করছে। আর মেন গেটের কাছে যাওয়ার উপায় নেই, শাকের বস্তায় গেট অবরুদ্ধ, তারমধ্যে স্লিপারের টিকিট, আর ট্রেন চলছে ঢুকঢুক করে আসামের প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে দিয়ে। গরমে দমবন্ধ পরিস্থিতি, অনেক কষ্টে বিশ্বনাথ চারালি, রাঙ্গাপাড়া পার হয়ে ভোর ৪টের দিকে গন্তব্যে পৌঁছলাম। ধুপধাপ করে শাকের বস্তা প্লাটফর্মে পড়তে লাগলো, নিমেষে যেন একটা বাজার হয়ে গেল স্টেশনটা। তখনো চারদিকে ঘন অন্ধকার, স্টেশনে কয়েকটা টিমটিমে বাতি ছাড়া কিছুই নেই, তারমধ্যে আকাশে মেঘ, সাথে ঝোড়ো হাওয়া আর টিপটিপ বৃষ্টি। এত লাগেজ নিয়ে কোনো রকমে শেডের তলায় ঢুকতেই বৃষ্টি তার আসল রূপ নিয়ে হাজির হল। সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং হলে পৌঁছে বসে অপেক্ষা করতে করতে কখন যেন চোখ লেগে গেছিল। হঠাৎ বাজ পড়ার আওয়াজে ঘুম ভাঙল, বাইরে দেখি যতদূর চোখ যায় শুধু ফাঁকা মাঠ আর দূরে পাহাড়, সেই মাঠে অহরহ বাজ পড়ছে, যেটা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সাথে মুষলধারে বৃষ্টি এবারে যেন ভয় ভয় হতে লাগলো যে বেড়ানোটা মাটি হতে চলেছে না তো ? ? সেই বৃষ্টি আর সাথে গরম চা, সে এক আলাদা অনুভূতি ! যথারীতি বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমাদের ট্রেনের জন্য।

বৃষ্টি বেশ ধরে এসেছে, ধীরে ধীরে প্রকৃতি আড়মোড়া ভেঙ্গে জাগছে। এখান থেকে আমাদের পরবর্তী কানেকটিং ট্রেন ৬টায়, নাহারলাগুন তিনসুকিয়া ইন্টারসিটি... যথাসময়ে একটি LHB ট্রেন, অন্ডালের WDG3A নিয়ে স্টেশনে প্রবেশ করলো।

এখান থেকে লোকো রিভার্স হয়ে, ট্রেন যেদিক থেকে এলো, ওই দিকেই যাবে, তবে অন্য রুটে, আসলে হারমতি থেকেই দুটো রুট - একটা নাহারলাগুন, আরেকটা ডিব্রুগড় যাচ্ছে। আমরা ট্রেনে উঠে নিজেদের আসন গ্রহন করলেও ভীষন ক্লান্তি লাগার কারণে ঠিক করলাম টিকিট আপগ্রেড করিয়ে এসিতে চলে যাবো, এবং তাই করলাম। আলাপ হলো এক দারুন মানুষের সাথে, ওই ট্রেনের যিনি প্রধান টিটিই ছিলেন, অর্জুন দত্ত। অমায়িক ভাল মানুষ, নামে বা পারিবারিক সূত্রে বাঙালি হলেও বহুকাল আসামে থাকার কারনে তিনি এখন আদ্যপান্ত অসমীয়া। ওনার এসি কোচের ডিউটি শেষ হওয়ার পর, অনেক গল্প হলো, নিজে হাতে করে আমাদের দেখিয়ে দিলেন কোথায় কেমন সুন্দর লোকেশন আছে, কখন বগীবিল ব্রিজ আসবে সব কিছু। আসলে উনি নিজে খুব অবাক এবং খুশি হয়েছিলেন যে আমরা শুধু রেলকে ভালোবেসে সুদূর কলকাতা থেকে ওনার নিজের মাটি আসাম এসেছি বেড়াতে।

মাঠঘাট, চাষের জমি চারদিকে সবুজ আর জলে ভরা নদী নালা, সে এক অসাধারণ আসাম, তারমধ্যে বৃষ্টি, সে সৌন্দর্য বলে বোঝানোর মতো নয়। তার মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটছে।দূরে গারো রেঞ্জের ধোঁয়াটে পাহাড়, তার গায়ে মেঘগুলি ঠিক যেন আলতো ভাবে লেপ্টে আছে.....

একে একে পেরিয়ে যাচ্ছে একেকটা স্টেশন। চারদিক শুধু সবুজ, দূরে পাহাড়, প্রত্যন্ত সব গ্রাম, ডিজেল সেকশন, আর দারুন দারুন সব ডিজেল ইঞ্জিন।লখিমপুর নর্থ স্টেশনে দেখা হলো, বৃষ্টি ভেজা IZN WDG4D এর সাথে!

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির সাথে রেলের চাকার আওয়াজ যোগ্য সঙ্গ দেয়। রাতের সেই ভ্যাপসা গরম উধাও হয়েছিল আগেই।এখন চারপাশের মনোরম পরিবেশ, অবাক করা দৃশ্য, বানভাসি আড্ডার এই কামরা সঙ্গে টুকিটাকি জলযোগ আর চা ! ! !

ধেমাজিতে অনেক্ষন আমাদের ট্রেন দাঁড়ালো, ১৫৮৯৬ মুরকণ্ডসেলেক-রঙ্গিয়া এক্সপ্রেসের সাথে ক্রসিং হলো, মালদার WDM3D ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে ঢুকলো। তার আগে নেমে ভালো করে স্টেশনটা হেঁটে ঘুরে দেখলাম, আর একটা কাজ করলাম, যে ট্রেনে এত আহ্লাদ করে ঘুরছি, তাকে ফ্রেমবন্দি করবো না তা কি হয়! তাই তারও ছবি তুললাম।

এবার আসছে সেই সর্বজনবিদিত ভারতের দীর্ঘতম ব্রিজগুলোর অন্তর্গত বগীবিল ব্রিজ, যা বহু বছরের চেষ্টায় তৈরি হয়েছে এবং এটি দ্বিতল ব্রিজগুলোর মধ্যে অন্যতম। ট্রেন উঠলো সেই ব্রীজে, নির্ধারিত গতিসীমা মেনে এগিয়ে চললো, ১১০ কিমি/ঘন্টার এই ব্রিজের ট্রায়াল হলেও গতিসীমা বেশ কমই রাখা হয়েছে! আর সেই বিশালাকার চেহারার ব্রিজ তো শেষই হয়না... প্রায় ৫ কিমি দীর্ঘ এই ব্রিজ পার করতে বেশ খানিক্ষণ সময় লাগলো। সে কি গর্জন ব্রহ্মপুত্রের, নদ না সমুদ্র বোঝা যায় না।

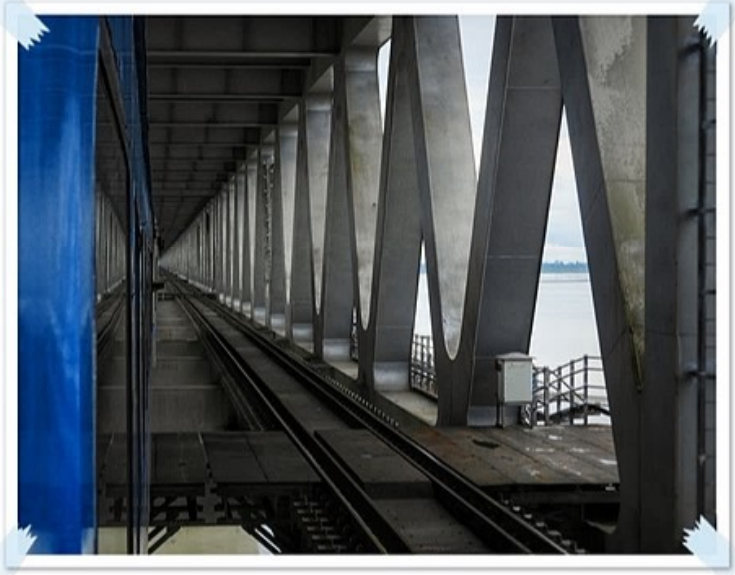

বৃষ্টি তখন ধরেছে, কিন্তু আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে বাইরের কিছু দৃশ্য লেন্সবন্দী করছি, আর অবাক হয়ে শুনছি দত্ত সাহেবের বলা নানা রকম মজাদার ঘটনা। উনি অল্প সময়ে আমাদের এতটা আপন করে নেবেন আমরা ভাবিনি... আরো বেশ কিছু ছোট ছোট স্টেশন পার করলাম, ওখানের বেশিরভাগ স্টেশনেই দেখলাম স্টেবলিং লাইন রয়েছে, আর তাতে নানা ট্রেনের রেক রাখা। মনে হয় ডিব্রুগড় স্টেশনে বেশি জায়গা না থাকার জন্য এমনটাই করা হয়। কিছুক্ষনের মধ্যে ট্রেন ঢুকলো ডিব্রুগড় স্টেশনে, চারদিকে EMD আর ALCo লোকো ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে, বেশ মজা পেলাম এটা ভেবে, আজ রেলফ্যানিং টা ভালোই জমবে। আর ভগবানেরও মনে হয় তেমনি ইচ্ছা ছিল। প্রথমেই দত্ত সাহেবের নিজের আতিথেয়তার পরিচয় দিয়ে আমাদের সাথেই নামলেন ডিব্রুগড় স্টেশনে, সেখানকার যে প্রধান টিটিই, মিস্টার গগৈ এর সাথে পরিচয় করালেন, এও বললেন আমাদের সব ব্যবস্থা করে দিতে, কারন আমরা ওই জায়গায় নতুন, তাই আমাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। আর পি এফ হেড মিনি ছিলেন, আলাপ হলো ওনার সাথেও, উনি আমাদের রেলফ্যানিং এর ব্যাপারে অভয় দিলেন।

তারপরেই আমরা আনন্দসহকারে দেখলাম, সূর্য দেব প্রকট হলেন ঝলমলে রোদ আর নীল আকাশ নিয়ে, আর দেরি না করে আমরা শুরু করলাম আমাদের ছবি তোলার কাজ, আর ঘুরে দেখতে লাগলাম স্টেশন এর চারপাশ। দেখা হলো, নিউ গুয়াহাটির EMD, ভারতের এখন অবধি সর্বশেষ EMD ইঞ্জিন ৪০৬০৮ এর সাথে।

এছাড়াও প্রাক্তন বোণ্ডামুন্ডার EMD, অন্ডালের ALCo, আশ্চর্যজনক ভাবে টুইন হাওড়া WDM3D শানটিং ডিউটিতে ব্যস্ত দেখলাম। এরপর ফ্রেশ হয়ে বেরোলাম বগিবিল ব্রিজের উদ্দেশ্যে, ব্রীজে ওঠার আগেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মালদা WDM3A নিয়ে রঙ্গিয়ার দিকে গেলো একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন, লোড সামলাতে না পেরে সবাই তাকে ক্যামেরা বন্দি করলাম।

ভালোই কাটলো সারা দিনটা, দিগন্ত ছোঁয়া বগীবিল ব্রিজ দেখে মনে হচ্ছিলো, এই ব্রিজ স্বর্গে গিয়ে শেষ হচ্ছে। কিন্তু আসাম পুলিশের খুব কঠোর নিয়মের জন্য কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের ফেরত আসতে হলো।

রুমে ফিরে এসে অসম্ভব ক্লান্ত লাগছিলো, আগের রাত পুরোটাই জাগা, তারপর যাত্রার ধকল, ভালো করে স্নান করে এসি চালিয়ে দিলাম লম্বা ঘুম, সেই ঘুম ভাঙল রাত ৮টায়, নিচে নেমে দেখি সে এক অদ্ভুত পুরী। খাঁ খাঁ করছে ডিব্রুগড় স্টেশন, কোনো ট্রেন আসা বা যাওয়ার খবর নেই, জনমানবহীন এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, মনে হচ্ছিলো কোনো প্রেতপুরিতে এসে গেলাম, এই স্টেশনে খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বন্ধুর মারফৎ জোগাড় করা খবরে জানলাম, স্টাফ ক্যান্টিনে আমরা রাতের খাবার সারতে পারি, এবং তাই করে, ঘরে এলাম আর সাথে সাথে শুরু হলো আড্ডা, সারাদিনের সবার অভিজ্ঞতা আর কার কি কি ছবি সংগ্রহে এসেছে, কিন্তু বেশিক্ষন এসব চালানো গেল না, কারন পরেরদিন খুব ভোরে আমাদের ট্রেন, যাতে করে আমরা গুয়াহাটি ফিরবো, ট্রিপের প্রায় শেষদিকে পৌঁছে গেছি আমরা তখন।

পরদিন ভোরবেলা রীতিমতো লাগেজ নিয়ে দৌড়ে ট্রেন পেলাম, ঘুম থেকে উঠতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিলো, ডিব্রুগড় ঝাঁঝা এক্সপ্রেস তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছাড়বার জন্য, সামনে নিউ গুয়াহাটি শেডের WDP4D ৪০৬০২।

ছুটে চললো ট্রেন, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে, কিন্তু সমস্যা হলো হাতে তখনো ১টা গোটা দিন বাকি ছিলো অথচ আমার ঘোরা প্রায় শেষ। এর মধ্যে অনেককিছু দেখলাম যেমন, পানিতলা স্টেশনে ডিব্রুগড় রাজধানী, বোকাজান স্টেশনে জোরহাট জনশতাব্দী, জামুগুড়ি তে অবধ আসাম এক্সপ্রেস আরো কত কি।

লামডিং পৌঁছে সেখানকার বিখ্যাত লবঙ্গ লতিকা খেলাম, আরো দেখতে লাগলাম অসাধারন সব বাঁক, বড়ো বড়ো মালগাড়ি, দুটো করে EMD ডিজেল ইঞ্জিন যুক্ত। এমন কিছু জায়গা দেখলাম দেখে মনে হবে ছবির মত সুন্দর, আর তার মধ্যে দিয়ে আমাদের ৪০৬০২ অসম্ভব সুন্দর একটা গমগম শব্দ করে ছুটে চলেছে।

এরপর আরও কিছু ছোট ছোট ক্রসিং দেখলাম, হঠাৎ দেখা হলো শিলিগুড়ি WDP4 এর সাথে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় শতাব্দীর, ঠিক মনে হচ্ছিলো নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দীকে দেখলাম! এসব পেরিয়ে বিকেল নাগাদ পৌঁছলাম গুয়াহাটি। লোকো বদলে ৪০৬০২ গেল বিশ্রাম নিতে, এদিকে বাকি রাস্তার নেতৃত্ব দিতে এলো অন্ডালের WDG3A

এতদিনের ঠিক করা সাজানো গোছানো সুন্দর ট্রিপ আমাদের শেষ হলো। বাকি রইল শুধু পরেরদিনের সরাইঘাট এক্সপ্রেসের যাত্রা, যথাসময়ে পরদিন হোটেল থেকে চেকআউট করে ট্রেনে উঠলাম আর ১৭ ঘন্টা ৪০ মিনিট কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেলো বুঝতেও পারলাম না। কাক ভোরে এসে নামলাম হাওড়া স্টেশনে। মন খারাপ হওয়ার দিন আবার শুরু, আবার সেই অফিস, রোজকার ব্যস্ত জীবন, ট্রাফিক জ্যাম, আর চারদিকে ইলেক্ট্রিক ট্রেন.... যাই হোক আপনারা মন খারাপ করবেন না। বেড়াতে যান, আর পারলে আপার আসাম অবশ্যই ঘুরে আসুন, নাহলে খুব আফসোস করবেন।

শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা।।।

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমস্ত ছবি লেখকের ব্যক্তিগত ভাবে তোলা এবং স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত।

২৫ বছর পর তিলোত্তমার
মেট্রোর পুনরায় পাতাল প্রবেশ

অর্কোপল সরকার

কলকাতার যান যন্ত্রণা কিন্তু খুব একটা নতুন বিষয় নয় , তাই তার থেকে মানুষকে রেহাই দিতে এবং দ্রুততার সাথে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বরাবরই সরকারি তরফে থেকে নিত্যনতুন পরিকল্পনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যার কিছু কিছু ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। এইরকমই একটি পরিবহন ব্যবস্থা হলো কলকাতা মেট্রো রেল তথা মানুষের কাছে তাদের আদরের "পাতাল রেল"। ভারতবর্ষের প্রথম মেট্রো রেল পরিষেবা চালু হয়েছিলো তিলোত্তমা শহর কলকাতার বুকেই। ১৯৭২ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা মেট্রো রেলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এর প্রায় এক যুগ পরে ১৯৮৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর এসপ্লেনেড থেকে নেতাজী ভবন স্টেশনের মধ্যে প্রথম মেট্রো রেল চলে। পরিকল্পনা অনুসারে ৩ টি লাইন এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল -- যেগুলি হল, দমদম - টালিগঞ্জ, রামরাজাতলা - সল্টলেক এবং দক্ষিণেশ্বর - ঠাকুরপুকুর।

এইগুলির মধ্যে ১৯৮৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর প্রথম লাইনটির সূচনা দিয়েই শুরু হয়েছিলো কলকাতা মেট্রোর জয়যাত্রা। বেশ কয়েকটি ধাপে ঠিক ১১ বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো ষ্টেশনের মাধ্যমে এই রেলপথ জুড়ে দিয়েছিল উত্তর ও দক্ষিন কলকাতাকে। তীব্র যানজটের দরুন সড়ক পথে যে দূরত্ব পাড়ি দিতে সময় লাগতো প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা সেই পথ মাত্র ৪০ মিনিটেই খুব আরামদায়ক ভাবে পৌঁছানো গেলো। এই রেল পথের বিস্তার ধীরে ধীরে পরিধি বাড়িয়ে দক্ষিনে নিউ গড়িয়া (২০১০ সালে) ও উত্তরে নোয়াপাড়া (২০১৩ সালে) পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর যে দ্রুততার সাথে এর বিস্তার হচ্ছে তাতে এই ট্রেনে চেপে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে মা ভবতারিণীর দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বর পৌঁছানো এখন মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা। যার ফলে তিলোত্তমার দুই বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বর জুড়ে যাবে এক রেল পথে।

উত্তর-দক্ষিণের ন্যায় পূর্ব ও পশ্চিম কলকাতা কে জুড়ে দেওয়ার জন্য আর একটি মেট্রো লাইনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, যা গৃহীত হয় ২০০৮ সালে। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা মতো এর যাত্রাপথ রামরাজাতলার বদলে হাওড়া ময়দান অবধি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগের মেট্রোর হাত ধরে ভারত যেমন পেয়েছিল প্রথম মেট্রো রেল ঠিক তেমনই এই রেলপথের হাত ধরে ভারত পেতে চলেছে প্রথম নদীর নীচ দিয়ে রেলপথ, যা জুড়ে দেবে হাওড়া কে ধর্মতলা শিয়ালদহ হয়ে সল্টলেক উপনগরীর সাথে। জমিজট, অর্থনৈতিক সঙ্কট, যাত্রাপথ পরিবর্তন ইত্যাদি নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে অবশেষে ১২ বছর পরে ২০২০ সালে এই মেট্রো প্রথম পর্বে তার যাত্রা শুরু করে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম অবধি। অত্যন্ত অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই লাইনের প্রতিটা ষ্টেশন ও ট্রেন প্রথম থেকেই নজর কেড়ে নেয় যাত্রীদের।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সল্টলেক স্টেডিয়ামের পরই এই লাইন ডানদিকে বেঁকে সুভাষ সরোবর এর গা ঘেঁষে পাতালে প্রবেশ করে ও তারপরের পুরোটাই পাতাল পথে।

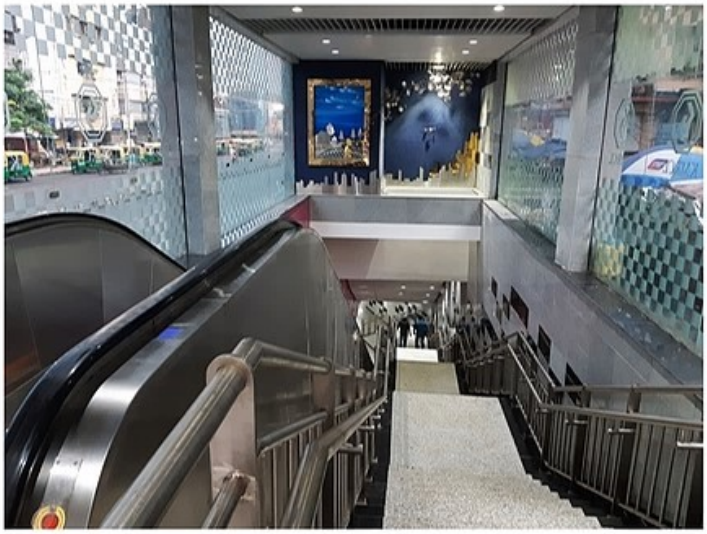

অত্যাধুনিক টানেল বোরিং মেশিন সহযোগে যে কাজ কলকাতাবাসীকে নূন্যতম কষ্ট দিয়েই চুপিসারে যে কখন সেরে ফেলা হয়েছে তা টের পাওয়া যায়নি। সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে পরের ষ্টেশন ফুলবাগান অবধি ১.৬৬ কিমি যাত্রাপথ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই কিন্তু নানাবিধ সুরক্ষাজনিত সমস্যা ও করোনা আবহে মার্চ মাস থেকে চলা দীর্ঘকালীন লক ডাউনে সেই পরিষেবা চালু করা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশেষে জুন মাসে আনলক ফেস শুরু হতেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় এই তৈরি হয়ে পড়ে থাকা বাকি পথটিকে যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করার কাজ, যা অবশেষে সমস্ত বাঁধা পেরিয়ে ২০২০ সালের ৪ঠা অক্টোবর খুলে যায়। কলকাতার মেট্রো আবার পাতাল প্রবেশ করে ২৫ বছর পরে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাট এন্ড কভার পদ্ধতি থেকে টানেল বোরিং প্রযুক্তি এই মেট্রো সবেতেই রেখেছে অত্যাধুনিকতার ছোঁয়া, তাই এইবারের পাতাল প্রবেশ একদমই অন্যরকম।৫ই অক্টোবর এ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় কলকাতার নবতম ভূগর্ভের ষ্টেশন "ফুলবাগান" , সন্ধে ঠিক ৬:২৬ মিনিটে রবীন্দ্র সংগীত এর সুরের ছোঁয়াতে ভাসিয়ে ট্রেনটি সল্টলেক স্টেডিয়াম ছেড়ে ধীরে ধীরে এগোল ফুলবাগানের পথে , ডানদিকে একটা বাঁক নিয়েই ট্রেন ধীরে ধীরে ভায়াডাক্ট থেকে নীচের দিকে নেমে এলো , বা দিকে সুসজ্জিত সুভাষ সরোবর , আর একটু এগোতেই ট্রেন ঢুকে পড়লো পাতালে। শুরু হল ২৫ বছর পরের আবার পাতাল যাত্রা। ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে ৬টা ট্রেন এসে দাঁড়াল ফুলবাগানে, অর্থাৎ এই যাত্রাপথের আপাতত অস্থায়ীরূপে শেষ ষ্টেশনে। এখানে নামতেই যেন চোখটা ধাধিয়ে যায়, সাধারণত কলকাতাবাসী যে ধরনের পাতালের ষ্টেশন দেখে অভ্যস্ত এ তার থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

প্লাটফর্মের দুই ধারে স্ক্রিনডোর যা কেবলমাত্র ট্রেন এলেই খোলে, অর্থাৎ নিরাপত্তা একদম আঁটোসাঁটো। চারিদিক একদম ঝাঁ চকচকে, প্লাটফর্মে নামার পর কনকোর্সে পৌঁছানোর জন্য রয়েছে একটি সুবিস্তৃত সিঁড়ি, একটি লিফ্ট ও দুটি চলমান সিঁড়ি।উপরে উঠতেই চোখে পড়বে ৪ টি টিকিট বুকিং কাউন্টার (আপাতত একটি কাজ করছে), দুটি টিকিট ও কার্ড বিক্রয় এর কিওস্ক, একটি কাস্টমার কেয়ার ডেস্ক। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট নজর করার মতো। যেমন ঢুকতে হলে থার্মাল স্ক্রিনিং ,ব্যাগেজ স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক। পরবর্তী কালে যাত্রীকে ধরে ধরে বডি চেকিং এর ও বন্দোবস্ত রয়েছে এই স্টেশনে।সমগ্র স্টেশনটির অত্যাধুনিক বাতানুকুল ব্যবস্থা অত্যন্ত মনোরম একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নবাগত যাত্রীদের সুবিধার্থে রয়েছে এরিয়া ভিত্তিক ম্যাপ ও বাইরে বেরোনো বা প্রবেশের জন্য ৩টি গেটের মধ্যে আপাতত ভাবে শুধুমাত্র একটি খোলা রয়েছে।

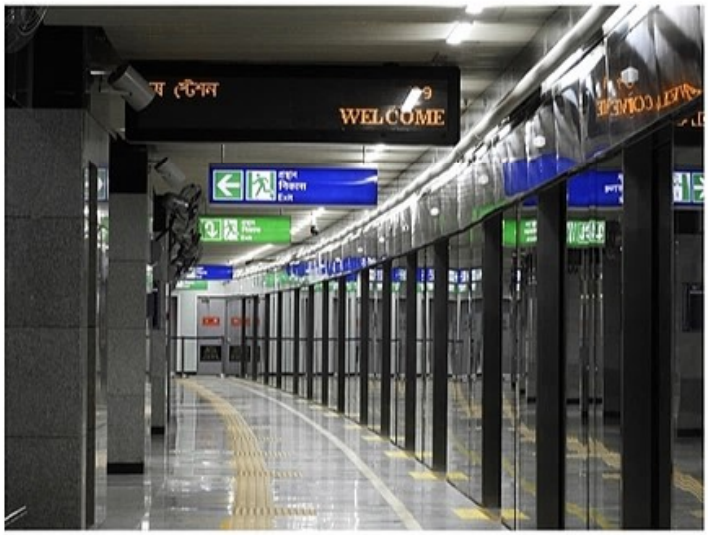

ফুলবাগান স্টেশনটি সিআইটি রোড ও নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত যা শিয়ালদহ থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে অবস্থিত। পরবর্তীতে লোকাল ট্রেন পরিষেবা আরম্ভ হলে এটি একটি সদা ব্যস্ত স্টেশন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। শুধু তাই নয় এই স্টেশন চালু হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো এর থেকে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোর দূরত্ব অনেকটাই কমে গেছে। এই স্টেশন থেকে উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনটি মাত্র ৪ কিমি। এই স্টেশন থেকে সল্টলেক সেক্টর-৫ পৌঁছাতে সময় লাগছে ১৬ মিনিট, তাও মাত্র 20 টাকায়, যে পথে বাসে লাগে ১ ঘণ্টা। অর্থাৎ এটা বলা বাহুল্য, যে নগরবাসির জীবনযাপন কোভিড-পরবর্তী সময় যতই স্বাভাবিকতার পথে ফিরবে, এই রেলপথের ভূমিকা ততই বেড়ে যাবে।

এর পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ ফুলবাগান থেকে শিয়ালদহ ও তারপর শিয়ালদহ থেকে হাওড়া পর্যন্ত পথের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে, তাই কলকাতার যান যন্ত্রণার কিছুটা প্রধান এলাকার রাশ টানতে খুব শীঘ্রই আসছে এই নতুন পাতালপথ, অপেক্ষা শুধুই আর একটু ধৈর্য্যের।

এই প্রতিবেদনের প্রতিটি ছবি প্রতিবেদকের নিজস্ব তোলা ও স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত।

জল ছবি

জল ছবি

আরাবল্লি পর্বতমালা ভেদ করে ছোট্ট অয়াই ডি এম ৪ এগিয়ে চলেছে নিজের গন্তব্য মাড়ওয়ার জংশনের দিকে।

- শুভদ্যুতি বোস

সাগরের ন্যায় সুবৃহৎ ব্রহ্মপুত্রের দুই বিস্তীর্ণ কূল সংযোগ করার চেষ্টায় মেঘাচ্ছন্ন নির্মীয়মাণ বগিবীল সেতু।

- শুভদ্যুতি বোস

মধ্যপ্রদেশের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য ভ্রমনপিপাসু দের পাশাপাশি রেলপ্রেমিদের ও আকর্ষিত করে। গাছপালা ও গহীন বনের সবুজ গালিচা এবং পাহাড়ি নদীর অপরূপ স্নিগ্ধতা;তার মধ্যেই এগিয়ে চলেছে হেরিটেজ ট্রেন, মনোরম পাতালপানির মধ্যে দিয়ে।

- সোমশুভ্র দাস

রেলপ্রেমিদের কাছে গোয়া মানেই কোঙ্কণ রেল ও তার অতুলনীয় সৌন্দর্য। এরনাকুলাম শেডের ১৪০৫১ এঙ্কো ডিজেল ইঞ্জিন ও তার সাথি বৃষ্টিস্নাত পরিবেশে হম্নাভার টানেল থেকে বেরচ্ছে গান্ধিধাম থেকে নাগেরকয়েল গামী এক্সপ্রেস ট্রেন কে সঙ্গে করে।

- সৌরভ দত্ত

জল ছবি

" হৃদয় মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু ".. তীব্র বর্ষনসিক্ত এক অপরাহ্নে দেরাদুন অভিমুখে ধাবিত উপাসনা এক্সপ্রেস, নেতৃত্বে হাওড়া ডব্লিউ এ পি ৪ #২২৩০৩..

- পূর্নাভ চক্রবর্তী

পবিত্র নর্মদা নদীর উপর দিয়ে ওমকারেশ্বর রোড থেকে মহু (বর্তমানে ডঃ আম্বেদকর নগর) গামী মিটার গেজ যাত্রীবাহী ট্রেন নিয়ে YDM4 নং ৬৬৬০ নিজের ছন্দে পেরচ্ছে। ওমকারেশ্বর রোড থেকে আমরা জাগ্রত ওমকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ এ তীর্থযাত্রা করতে পারি। এই ট্রেনটি ফের কালাকুন্ডে হেরিটেজ ট্রেনটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহুতে ফিরে আসে।

- সৌরভ দত্ত

কি ভাবছেন? এত লম্বা একটি যাত্রীবাহী ট্রেন? মোটেই নয়, দাদার থেকে ভুজগামী সায়াজিনগরী এক্সপ্রেস ও ভাপি থেকে ভিরার শাটল ট্রেন একে অপরকে অতিক্রম করছে।

- সৌরভ দত্ত

দেশের কিছু অনন্য লোকোমোটিভের মধ্যে অন্যতম WCAM3 যা AC এবং DC দুই বিদ্যুতেই ছুটতে পারে। এমনই এক কল্যান শেডের লোকো ১৭০৫৮ ডাউন দেবগিরি এক্সপ্রেস কে নিয়ে থানে অতিক্রম করছে।

- সৌরভ দত্ত

মধ্য ভারতের রুক্ষ ভুমি সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে যতটাই কষ্টকর, রেলপ্রেমিদের কাছে ততটাই চক্ষুভিরাম। ২২৬৮৬ চণ্ডীগড় থেকে যশবন্তপুর গামী কর্ণাটক সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস দান্দাউজ স্টেশনের কাছে এক বিশাল বাঁক অতিক্রম করছে, কৃষ্ণরাজাপুরম শেডের ই এম ডি ইঞ্জিন এর সঙ্গে।

- সৌরভ দত্ত

পশ্চিম রেলের বৈতরনা খাঁড়ির উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ২২৯৩৫ পালিতানা-বান্দ্রা গামী সুপারফাস্ট ট্রেন। এর সঙ্গেই উপস্থিত ভারতের বানিজ্যনগরীর লাইফ লাইন ই এম উ লোকাল যা দাহানুর উদ্দেশে যাত্রা করছে।

- সৌরভ দত্ত

"আমার শৈশবের দার্জিলিংটা..." বাঙালি মানেই দার্জিলিং আর দার্জিলিং মানেই কাঞ্চনজঙ্ঘা আর টয় ট্রেন। উনেস্কো সম্মানপ্রাপ্ত ,পৃথিবী বিখ্যাত দার্জিলিং হিমালায়ন রেলওয়ে কে লেনসবন্দি না করতে পারলে দার্জিলিং ভ্রমণ অসমাপ্ত থেকে যায়। বাতাসিয়া লুপ ও টয় ট্রেন নানাভাবে নানা সময় চলচিত্র,ছবি তে দেখা গেছে,সেখান দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েই আমার এই ছোট প্রচেষ্টা।

- অনমিত্র বোস

হাওড়া শেডের ডব্লু ডি পি ৪ ডি ৪০৪২৯ এবং সমস্তিপুর ডিজেল শেডের ডব্লু ডি জি ৩এ ১৩৬১১ আহমেদপুর স্টেশন থেকে রামপুরহাটের দিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে ধাবমান ।

- সৌম্যজ্যোতি দে

জল ছবি

মুম্বই থেকে তিরুবন্থপুরম গামী নেত্রাবতী এক্সপ্রেস,কে নিয়ে কল্যান ডিজেল শেডের WDG3A জোড়া ধোঁয়া উড়িয়ে থানে ক্রিকের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

- সৌরভ দত্ত

প্রাণ খোলা আকাশ, মন ভরা জঙ্গল - ডুয়ার্স এবং কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস।

- অনীশ ব্যানার্জি

শিলিগুড়ি শেডের WDP4 ও ভারতের দ্রুততম ডিজেল চালিত শতাব্দি এক্সপ্রেস এক কিংবদন্তী অধ্যায়। এক রৌদ্রজ্জ্বল দুপুরে হাওড়া গামী শতাব্দি এক্সপ্রেস।

- অভিষেক রায়

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার এক অনন্য নিদর্শন হল সম্প্রীতি সেতু, যা শতাব্দীপ্রাচীন জুবিলী ব্রিজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে । হাওড়া ও শিয়ালদহ শাখাকে সংযোগকারী লোকাল ট্রেন ছুটে চলেছে এই ব্রিজের উপর দিয়ে।

- অভিষেক রায়

জল ছবি

মধুবনি পটচিত্রের সৌন্দর্য্যে সজ্জিত সমস্তিপুর ডাবলু ডি এম ৩ এ ১৬৬৫৫ -এগিয়ে চলেছে শিয়ালদহ গামী গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস নিয়ে।

- অনীশ ব্যানার্জি

পাহাড়, নদী, ব্রিজ ও টানেল পেরিয়ে ছুটে চলে এখানকার লৌহশকট। কর্ণাটকের মনোরম সাঙ্কালেশ্বর সুব্র্যামন্যম ঘাট সেকশনে ছুটে চলেছে ৩ টি কৃষ্ণরাজাপুরম শেডের ইএমডি ডিজেল ইঞ্জিন ,সঙ্গে কারোয়ার গামী এক্সপ্রেস।

- হৃষীক মুখার্জি

এক বৃষ্টিস্নাত দিনের দুপুরে অবিরাম বারিধারার মাঝেই তার আগমন। গুরুগম্ভীর শব্দ করে সে যখন এই শতাব্দিপ্রাচীন বজবজ শাখায় প্রবেশ করলো তখন বরুনদেব ও বোধহয় তাকে আহ্বান জানালেন এক ঝলক ঝকঝকে রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে। ফরাসি কোম্পানি এলস্তম দ্বারা নির্মিত, ভারতীয় রেল এর নব্য সংযোজন অপরূপ সুন্দর WAG12B লোকমটিভ মৃদুমন্দ গতিতে কনটেইনার পণ্য নিয়ে খিদিরপুর পোর্টের দিকে ধাবমান।

- অনমিত্র বোস

"নীল দিগন্তে, ঐ ফুলের আগুন লাগলো, লাগলো.... নীল দিগন্তে। বসন্তে, সৌরভের শিখা জাগলো,বসন্তে, নীল দিগন্তে।"

ক্ষীরাই এর বিস্মৃত ফুলের বাগান যেন শীতকালে এক মিলনক্ষেত্র।হাওড়ার লাল দৈত্য যেন এই গানের ছন্দেই কাঁসাই নদীর ওপর দিয়ে মুজ্জফরপুর এর উদ্দেশে চলেছে।

- অনমিত্র বোস

আগামী পয়লা বৈশাখ আমরা নিয়ে আসছি ভারতীয় রেল মানচিত্রের থেকে মুছে যাওয়া ছোটো রেলের সাতকাহন "ছোটো রেলের ইতিকথা"

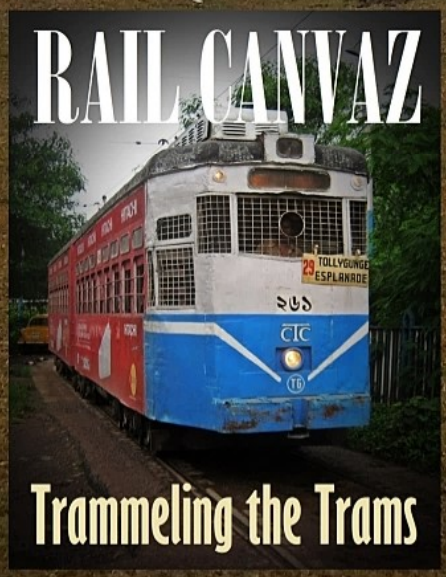

২০২১ -এর বর্ষবরণ করব আমরা ট্রামের ওপর বিশেষ সংখ্যা দিয়ে.... কলকাতার রাস্তা থেকে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাওয়া ট্রামের নিজস্ব জগতের খুঁটিনাটি "Trammeling the Trams" নিয়ে হাজির হব আমরা